বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
গীতাঞ্জলি বড়ুয়া
ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
উত্তরা চৌধুরী

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

মো: জিয়াউল হক

আলেয়া আক্তার

কম্পিউটার কম্পোজ

বর্ণনস কালার স্ক্যান

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

তিতাস চাকমা

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সদাচরণ, সর্বজীবে দয়া, সংযম ও শীল অনুসরণে আগ্রহী হবে। গৌতম বুদ্ধের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষার্থী তার সৎ ও আলোকিত জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম	১-১৩
দ্বিতীয়	বন্দনা	১৪-২২
তৃতীয়	শীল	২৩-৩০
চতুর্থ	দান	৩১-৩৮
পঞ্চম	সূত্র ও নীতি গাথা	৩৯-৫১
ষষ্ঠ	চতুরার্য সত্য	৫২-৫৭
সপ্তম	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব	৫৮-৬৯
অষ্টম	চরিতমালা	৭০-৮২
নবম	জাতক	৮৩-৯৪
দশম	বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান	৯৫-১০৬
একাদশ	বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিম্বিসার	১০৭-১১২

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর ধর্মের অনুসারীদেরকে বৌদ্ধ বলা হয়। আমরা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। ছোটবেলা থেকেই জীবের প্রতি ছিল গৌতম বুদ্ধের অপরিসীম মমত্ববোধ। ছোট-বড় সকল প্রাণীকে তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর সেবায় ও আদরে অনেক প্রাণী সুস্থ হয়েছে এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহে বুদ্ধের জীবপ্রেমের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* বুদ্ধের জীবপ্রেম ব্যাখ্যা করতে পারব।
* গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।
* সকল প্রাণীর প্রতি কীভাবে মৈত্রী প্রদর্শন করতে হয় তা বলতে পারব।

পাঠ : ১

গৌতম বুদ্ধের পরিচিতি

খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলাবস্তুর লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রাজা শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম ছিল রানি মহামায়া। সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মাতা রানি মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন। তারপর সিদ্ধার্থের লালন-পালনের দায়িত্ব নেন রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি রানি মহামায়ার বোন ছিলেন। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে সিদ্ধার্থের অপর নাম হয় গৌতম। শাক্যরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত।

সিদ্ধার্থের জন্মের খবর শুনে অনেক জ্যোতিষী রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। তাঁরা শিশু সিদ্ধার্থের মধ্যে বত্রিশটি সুলক্ষণ দেখতে পান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'এই রাজকুমার গৃহে থাকলে রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করলে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।' কিন্তু একমাত্র ঋষি অসিত বলেন, রাজকুমার মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।

রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং রাজা শুদ্ধোদনের অপরিসীম স্নেহ-মমতায় সিদ্ধার্থ ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। রাজা রাজকুমারের শিক্ষার জন্য বহু শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত নিয়োগ করেন। তিনি এঁদের নিকট নানা লিপিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। ক্রমে তিনি ঘোড়ায় চড়া, রথচালনা, অসি-চালনা, যুদ্ধকৌশল এবং অন্যান্য বিদ্যা শেখেন। রাজকুমারের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে গুরু বিস্মিত হন। অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সকল শাস্ত্র ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

রাজকীয় পরিবেশে রাজকুমার ক্রমে কৈশোরে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু কৈশোর বয়স থেকেই রাজকীয় ভোগ-বিলাসে তিনি উদাসীন ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে একাকী নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতে দেখা যেত। রাজকুমারের ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীনতা দেখে রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে অস্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকেন। ক্রমে রাজকুমার সিদ্ধার্থ যৌবনে পদার্পণ করেন। কিন্তু রাজা লক্ষ করলেন, যতই দিন যাচ্ছে কুমার ততই উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন। তিনি রাজকুমারকে ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত রাখার জন্য সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদের

ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোনো কিছুই রাজকুমারকে আকৃষ্ট করতে পারল না। অবশেষে রাজা অমাত্যদের (মন্ত্রী) সঙ্গে পরামর্শ করেন। অমাত্যগণ রাজকুমারকে সংসারমুখী করার জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। সপ্তাহব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের মধ্য দিয়ে যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যশোধরা গোপাদেবী নামেও পরিচিত ছিলেন।

বাল্যকাল হতে সিদ্ধার্থের মনে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, যৌবনে এসে তা আরো বৃদ্ধি পায়। রাজ-অন্তঃপুরের ভোগ-বিলাসের মধ্যেও সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না। একদা তাঁর নগরভ্রমণের বাসনা হলো। রাজা ঘোষণা করে দিলেন, রাজকুমার নগরভ্রমণে যাবেন, পথ-ঘাট সব যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। নির্দেশ দিলেন, কোনো অসুন্দর দৃশ্য যেন রাজকুমারের দৃষ্টির মধ্যে না পড়ে। রাজার আদেশে রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করা হলো। রাজকুমার নগরভ্রমণে বের হলেন। সাজসজ্জা দেখে রাজকুমারের প্রথম মনে হলো জগতে দুঃখ, বেদনা, হতাশা নেই। কিছুদূর যাওয়ার পর রাজকুমার দেখলেন, এক জরাজীর্ণ দুর্বল বৃদ্ধ বক্রদেহে লাঠিতে ভর দিয়ে অতিকষ্টে পথ চলছে। সিদ্ধার্থ রথচালক ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কে?' ছন্দক বললেন, 'এক বৃদ্ধ'। সিদ্ধার্থ বললেন, 'সকলেই কি বৃদ্ধ হবে, আমরাও?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সকলেই বৃদ্ধ হবে। এটাই জগতের নিয়ম।' ছন্দকের কথা শুনে বিষণ্ন মনে সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

পরদিন আবার নগরভ্রমণে বের হন। দ্বিতীয় দিন দেখতে পেলেন, ব্যাধিগ্রস্ত এক লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সিদ্ধার্থ ছন্দকের নিকট কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই লোক ব্যাধিগ্রস্ত, সংসারের যে কেউ যেকোনো সময় এ রকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। সিদ্ধার্থ বিষণ্ন মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

তৃতীয় দিন সিদ্ধার্থ আবার নগরভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন চারজন লোক একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে একদল লোক ক্রন্দন ও বিলাপ করছিলো। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছন্দক বলেন, 'জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সকলেই মৃত্যুর অধীন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।' সিদ্ধার্থ বিষণ্ন মনে পুনরায় রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

চতুর্থ দিন রাজকুমার পুনরায় নগর ভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন শান্ত, সৌম্য, গেরুয়া বসনধারী মুণ্ডিত মস্তক এক সন্ন্যাসী ধীরগতিতে পথ চলেছেন। পরিচয় জানতে চাইলে ছন্দক বলেন, 'ইনি সংসার ত্যাগী বন্ধনহীন এক মুক্ত পুরুষ। ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে শান্তি অন্বেষণ করছেন।' ছন্দকের কথা শুনে সিদ্ধার্থ খুশি হন এবং গৃহত্যাগের সংকল্প করে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন

সিদ্ধার্থ যখন সংসার ত্যাগের চিন্তায় অস্থির তখন খবর এলো তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। খবর শুনে তিনি বিচলিত হয়ে বললেন, 'রাহু জন্মেছে, বন্ধন জন্মেছে।' তাই পুত্রের নাম রাখা হলো রাহুল। পুত্রের জন্মসংবাদ শুনে সিদ্ধার্থ দৃঢ় সংকল্প করলেন, 'আর কালবিলম্ব না করে সকল বন্ধন ছিন্ন করে শীঘ্রই বেরিয়ে পড়ব।'

নিদ্রামগ্ন গোপাদেবী ও পুত্র রাহুলকে সিদ্ধার্থের শেষ দর্শন

ক্রমে সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে উপনীত হন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। রাজ-অন্তঃপুরের সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সিদ্ধার্থ বিদায়কালে গোপাদেবী ও প্রাণপ্রিয় পুত্রকে শেষবারের মতো দেখার জন্য গোপার কক্ষে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, গোপা শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন। একবার ইচ্ছা হলো শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করবেন। পরক্ষণে ভাবলেন, কোলে তুলে নিলে মা জেগে উঠবেন, তাহলে তাঁর যাওয়াই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আত্মসংবরণ করে তিনি গোপার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন।

অতঃপর রথচালক ছন্দককে নির্দেশ দিলেন অশ্ব কন্থককে প্রস্তুত করে নিয়ে আসতে। ছন্দক কন্থককে নিয়ে এলে উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে গৃহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগকে 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' বলা হয়। অনোমা নদী পার হয়ে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বললেন, 'তুমি কন্থককে নিয়ে ফিরে যাও।' ছন্দক গৌতমকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মন কষ্টে ব্যথিত হয়ে উঠল। প্রিয় অশ্ব কন্থক শোকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। সিদ্ধার্থ পায়ে হেঁটে বৈশালী নগরে পৌঁছলেন। ঋষি আরাড় কালাম, রামপুত্র রুদ্রকের কাছে ধ্যান, যোগ ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করলেন। তাতে তাঁর মন তৃপ্ত হলো না। সেখান থেকে গেলেন রাজগৃহে। রাজগৃহ থেকে উরুবেলার সেনানী গ্রামে। গ্রামটি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখানে অশ্বত্থ গাছের নিচে শুরু করেন কঠোর ধ্যান-সাধনা। ছয় বছর কাটল সেই ধ্যান-সাধনায়। অবশেষে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লাভ করেন বুদ্ধত্ব, জগতে খ্যাত হন বুদ্ধ নামে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট ধর্ম প্রচার করছেন

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করেন, যা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে অভিহিত। সকল প্রাণীর দুঃখমুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য তিনি সুদীর্ঘ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর তাঁর অমৃতময় ধর্মবাণী প্রচার করেন এবং আশি বছর বয়সে কুশিনারার শালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

চারি নিমিত্ত কী কী?

পাঠ : ২
গৌতম বুদ্ধ ও জীবপ্রেম

বৌদ্ধধর্মে জীবপ্রেমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের জীবন জীবপ্রেমে সিক্ত। শুধু মানুষ নয়, ছোট-বড় সকল জীবের প্রতি বুদ্ধের অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল। 'সকল প্রাণী সুখী হোক' – বৌদ্ধদের অন্যতম কামনা। বুদ্ধের প্রতিটি ধর্মবাণীতে রয়েছে জীবপ্রেমের অমিয় আহ্বান। সকল বৌদ্ধকে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি হচ্ছে – প্রাণী হত্যা করব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। এই শীলের মধ্যে শুধু প্রাণীর প্রতি গভীর মমত্ববোধই প্রকাশিত হয়নি, অধিকন্তু ছোট-বড় সকল প্রাণীকে রক্ষা করার প্রেরণাও রয়েছে। তাই বাঘ, হরিণ, হাতিসহ বনের কোনো প্রাণীই শিকার বা হত্যা করা উচিত নয়। বুদ্ধের জীবপ্রেমের একটি কাহিনী নিচে তুলে ধরা হলো।

সিদ্ধার্থ ও রাজহংস

বুদ্ধের বাল্যজীবনের ঘটনা। একদিন সিদ্ধার্থ পুষ্প উদ্যানে একাকী বসে ছিলেন। এমন সময় সাদা মেঘখণ্ডের মতো এক ঝাঁক রাজহাঁস পরম আনন্দে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি রাজহাঁস তীরবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় তাঁর সামনে পতিত হয়। শরাহত রাজহাঁসটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল। সিদ্ধার্থ পরম যত্নে রাজহাঁসটিকে কোলে তুলে নিলেন। রাজহাঁসটির শরীর থেকে শর বের করলেন, ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে পরম মমতায় সেবা সুশ্রুষা করে রাজহাঁসটিকে সুস্থ করে তুললেন। পরম সুখে রাজহাঁসটির দুচোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হলো এবং সিদ্ধার্থের দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাকিয়ে রইল। এমন সময় বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতা দেবদত্ত সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'শরবিদ্ধ রাজহাঁসটি আমার। আমিই তীর নিক্ষেপ করে রাজহাঁসটিকে ভূমিতে পতিত করেছি। আমার হাঁস আমাকে দাও।' তখন মমতায় ভরা কণ্ঠে সিদ্ধার্থ বললেন, 'ভাই দেবদত্ত! যে প্রাণ রক্ষা করে প্রাণীর ওপর তারই অধিকার। যে প্রাণ হননে উদ্যত হয়, প্রাণীর ওপর তার অধিকার থাকতে পারে না। হাঁসটি মৃত নয়, আহত মাত্র। আমিই সেবা দিয়ে সুস্থ করে হাঁসটির জীবন রক্ষা করেছি। তাই হাঁসটি আমার। আমি এই শাক্যরাজ্য তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু হাঁসটি দেব না।' এরূপ বলে সিদ্ধার্থ হাঁসটি আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

শরাহত রাজহাঁসকে কুমার সিদ্ধার্থ সেবা করছেন

অনুশীলনমূলক কাজ
আহত রাজহংসটি কার? তোমার মতামত দাও।

পাঠ : ৩

বুদ্ধের মৈত্রী প্রদর্শন

পালি 'মেত্তা' শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে মৈত্রী যার সমার্থক শব্দ হচ্ছে মিত্রতা, বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালোবাসা, হিতচিন্তা, পরোপকারিতা, শুভেচ্ছা, সৌহার্দ্য, সৌজন্যবোধ ইত্যাদি। মৈত্রী মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা সংস্কার। এটি হিংসা বিদ্বেষের বিপরীত দিক। হিংসা-বিদ্বেষ পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণার জন্ম দেয়। ফলে মনের মধ্যে হিংসার দাবানল জ্বলে। এতে মানুষের মন হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ংকর হয়। ফলে, সে যেকোনো অন্যায়-অবিচার ও প্রাণী হত্যার মতো খারাপ কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। মৈত্রী মানুষের মনকে উদার, শান্ত এবং ঈর্ষামুক্ত রাখে। মৈত্রী মন থেকে ক্রোধ, হিংসা, হীন প্রবৃত্তি দূরীভূত করে এবং অপরের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও মানবতাবোধ জাগ্রত করে। বুদ্ধ বলেছেন, 'মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে, ত্যাগ দ্বারা কৃপণকে জয় করবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে'। বুদ্ধ আরো বলেছেন, 'মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করবে।' নিম্নে বুদ্ধের মৈত্রী প্রদর্শনের একটি কাহিনী তুলে ধরা হলো।

শ্রমণ গৌতম ও ছাগশিশু

গৃহত্যাগের পর একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম রাজগৃহ থেকে বৈশালী যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে এক ছাগশিশুর করুণ কান্না তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ সময় তিনি ছাগশিশুটি কোলে তুলে নিয়ে রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদেরকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো'। রাখাল বলল, 'এগুলো রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে।'

পুত্রসন্তান কামনায় রাজা বিম্বিসার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তিনি ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করেন যে, রাজ্যে যত ছাগশিশু আছে সেগুলো যেন রাজপ্রাসাদে আনা হয়। রাখালের মুখে এ কথা শুনে শ্রমণ গৌতম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ এতগুলো অবোধ প্রাণীর রক্তে প্লাবিত হবে যজ্ঞভূমি। তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। রাজপ্রাসাদের সামনে একটি মন্দির। সেই মন্দিরের সামনে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরোহিতরা মন্ত্র পাঠ করছিলেন। ছাগশিশুর করুণ কান্নায় তাঁদের মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ চাপা পড়ে যায়। এ অবস্থায় কোলে ছাগশিশু নিয়ে মহাযজ্ঞস্থলে সিদ্ধার্থ গৌতম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাজা আনন্দিত হলেন। রাজা বললেন, 'আমার কী সৌভাগ্য যে আমার অনুষ্ঠানে নবীন সন্ন্যাসীও অংশগ্রহণ করছেন।' শ্রমণ গৌতম চারদিকে এক পলক তাকিয়ে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।' তখন রাজা বললেন, 'আপনার প্রার্থনা আমাকে বলুন। আমি আপনার প্রার্থনা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

শ্রমণ গৌতম তখন বললেন, 'আমি ছাগশিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাই।' রাজা বললেন, 'পুত্র লাভের আশায় আমি ধর্মীয় বিধান অনুসারে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি। এখানে সহস্র ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে। আপনি আমার যজ্ঞ নষ্ট করবেন না।' সিদ্ধার্থ গৌতম বললেন, 'মহারাজ, আমি আপনার যজ্ঞ নষ্ট করতে চাই না। বিনা রক্তে যদি আপনার দেবতা তুষ্ট না হন তবে এ ছাগশিশুর পরিবর্তে আমাকে বলি দিন। এতে আপনার নরহত্যাজনিত পাপ হবে না। কারণ আমি স্বেচ্ছায় আত্মদান করছি।' গৌতম পুনরায় রাজা বিম্বিসারকে বললেন, 'মহারাজ, শুনুন ওই ছাগশিশুর কান্না। পশুর পরিবর্তে মানুষ পেলে আপনার দেবতা আরো বেশি তুষ্ট হবেন। সুতরাং আমাকে বলি দিন। এতে যজ্ঞও হবে, ছাগশিশুরাও জীবন ফিরে পাবে।' এ কথা বলে শ্রমণ গৌতম যূপকাষ্ঠে বন্দী ছাগশিশুকে মুক্ত করে দিলেন এবং নিজেকে বলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

সিদ্ধার্থ নিজের জীবনের বিনিময়ে ছাগশিশুর মুক্তি কামনা করছেন

এ দৃশ্য দেখে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পুরোহিতরা মন্ত্রপাঠ বন্ধ করে দিলেন। তখন রাজা বিম্বিসারের মনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। রাজা বললেন, 'হে জ্ঞানতাপস! অহংকার ও আভিজাত্যে আমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল। আপনি আজ আমাকে সত্যের পথ দেখালেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।' এ বলে রাজা সকল ছাগশিশু ছেড়ে দিতে এবং যজ্ঞ বন্ধের আদেশ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তখন থেকে রাজা বিম্বিসার তাঁর রাজ্যে চিরদিনের জন্য পশুবলি বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

ছাগশিশুগুলো কীভাবে জীবন ফিরে পেল?

পাঠ : ৪

গৌতম বুদ্ধ ও অহিংসা নীতি

বুদ্ধ অহিংসবাদী ছিলেন। তাই বৌদ্ধধর্মকে অহিংসার ধর্ম বলা হয়। অহিংসা শব্দের সাধারণ অর্থ হলো হিংসা না করা। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে 'অহিংসা' শব্দটির বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। বৌদ্ধমতে অহিংসা শব্দের অর্থ হলো হিংসা না করা, কায়-মন-বাক্যে হিংসা বর্জন, কারো অনিষ্ট না করা, প্রাণী হত্যা না করা, সকল জীবকে রক্ষা করা, মানবতা, কোমলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি। বুদ্ধ বলেছেন, 'শুধু নিজেকে ভালোবাসলে হবে না, ভালোবাসতে হবে সকল জীবকে।' বুদ্ধ এ নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এখানে একটি অহিংসা বিষয়ক কাহিনী তুলে ধরা হলো।

বৃদ্ধা মা ও বউ

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে কাত্যায়নী নামে একজন মহিলা বসবাস করতেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল তাঁর খুবই আদরের। তিনি পরম মমতায় তাকে লালন-পালন করেন। মায়ের বয়স হলে ছেলেটিও তাঁর সেবা ও যত্ন করতেন। মায়ের বিপদ-আপদকে নিজের বিপদ-আপদ মনে করতেন। বলা যায়, খুব যত্নসহকারে মায়ের দেখাশোনা করতেন। এভাবে মা ও ছেলে দুজনই সুখে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন মা মনে করলেন, আমি আর কত দিন বাঁচব— এ ভেবে এক সুন্দরী মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পরও ছেলে আগের মতো তার মায়ের সেবা-যত্ন করতে থাকে। মায়ের প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা দেখে সুন্দরী বউয়ের মনে খুব হিংসা উৎপন্ন হলো। কিন্তু হিংসা স্বামীকে দেখাতে পারত না। এভাবে স্ত্রীর হিংসা দিন দিন আরো বাড়তে থাকে। হিংসাবশত স্বামীর সাথে সে প্রায়ই, ঝগড়া-বিবাদ করত। একদিন ঝগড়ার সময় স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'তোমার মায়ের সাথে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার মাকে চলে যেতে বলো, নতুবা আমি চলে যাব।'

ছেলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য বলল, 'মা! তুমি আমার স্ত্রীর সাথে রোজই ঝগড়া করো। যেদিকে তোমার মন চায় চলে যেতে পারো।' মনের দুঃখে মা দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিন-রাত পরিশ্রম করার বিনিময়ে মা নিজের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলেন।

এদিকে বউয়ের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। নাতি হয়েছে শুনে মা খুবই খুশি হলেন। তবে মনে ব্যথা পেলেন। তিনি ভাবলেন : আমার আদরের নাতিকে আমি আজও দেখতে পেলাম না। বিনা অপরাধে আমি ঘরছাড়া। পৃথিবীতে কি ধর্ম বলতে কিছুই নেই? এরূপ বলে মা আক্ষেপ করলেন। মা স্থির করলেন ধর্মপূজা করবেন। থালায় সাজালেন নানাবিধ ফুল, পানি, সুগন্ধি আর প্রদীপ। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র অসহায় মায়ের করুণ অবস্থা দেখলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তিনি উপস্থিত হলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, 'বুড়িমা, তুমি কী করছো?'

বুড়িমা উত্তর দিলেন, 'আমি ধর্মপূজা করছি।'

তখন বুড়িমা ছেলে ও বউয়ের সব কথা খুলে বললেন।

ইন্দ্র বললেন, 'মা, তুমি দুঃখ করো না। খুব শীঘ্রই তোমার বউ ও ছেলের মনের পরিবর্তন হবে। কারণ তাদেরও একটি ছেলে হয়েছে। তুমি ঘরে যাও। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।'

দেবরাজ ইন্দ্রকে মা ভক্তি সহকারে প্রণাম জানিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলেন। এদিকে তাঁর বউয়ের যে হিংস মনোভাব ছিল তা আর নেই। যে ক্রোধ দেখাত সেগুলো আর নেই। বউয়ের মন দমিত হলো। নিজের হিংসাকে সে প্রশমিত করল। পথের অর্ধেক যেতে না যেতেই মা দেখলেন ছেলে আর বউ নাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি বৃদ্ধ মায়ের কোলে নাতিকে তুলে দিল। ওরা দুজনে বলল 'মা, দেখ তোমার নাতি। বউ তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। মাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল। নিজের হিংসা ত্যাগ করে আবার সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।'

অনুশীলনমূলক কাজ
অহিংসা শব্দের অর্থ লেখ।
হিংসার কুফল বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. সিদ্ধার্থের অপর নাম ছিল ....।
২. সিদ্ধার্থের জন্মের খবর শুনে অনেক .... রাজপ্রাসাদে আগমন করেন।
৩. যশোধরা .... নামেও পরিচিত ছিল।
৪. বৌদ্ধধর্মে .... সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৫. ছোট-বড় সকল জীবের প্রতি .... অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পুরাহিতরা মন্ত্রপাঠ	সিদ্ধার্থ খুশি হলেন
২. শরাহত রাজহাঁসটি	মধ্যেও সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না
৩. ছন্দকের কথা শুনে	বন্ধ করে দিলেন
৪. রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করা হলো	রাজার আদেশে
৫. রাজ-অন্তঃপুরের ভোগ-বিলাসের	মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিদ্ধার্থকে গৌতম বলা হয় কেন?
২. সিদ্ধার্থ কী কী বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?
৩. বুদ্ধ কোথায় ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীবপ্রেম সম্পর্কিত 'সিদ্ধার্থ ও রাজহংস' কাহিনীটি বর্ণনা কর।

২. বুদ্ধের অহিংসা নীতি বিষয়ক গল্পটি ব্যাখ্যা কর।

৩. শ্রমণ গৌতম ও ছাগশিশুর কাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাখিটিকে খেলার ছলে কে আঘাত করেছিলেন?

ক. সিদ্ধার্থ খ. রাহুল

গ. দেবদত্ত ঘ. পুরোহিত

২. রাজা বিম্বিসার কেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজন করেন?

ক. পুত্রসন্তান লাভের প্রত্যাশায় খ. ছাগশিশুকে রাজপ্রাসাদে আনার জন্য

গ. রাজ্য বিস্তার করার জন্য ঘ. রাজ্যের মঙ্গল কামনার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপন বড়ুয়া ও সুমন বড়ুয়া দুজন বৈমাত্রেয় ভাই। রিপন বড়ুয়ার স্ত্রী গুণবতী মহিলা। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। তাই সুমন বড়ুয়ার স্ত্রী তার প্রতি বিভিন্নভাবে বিরূপ আচরণ করতে শুরু করে।

৩. সুমন বড়ুয়ার স্ত্রীর এরূপ আচরণকে বৌদ্ধ পরিভাষায় কী বলা যায়?

ক. হিংসাত্মক মনোভাব খ. শত্রুতা মনোভাব

গ. রাগী মনোভাব ঘ. দ্বেষের মনোভাব

৪. সুমন বড়ুয়ার স্ত্রীর আচরণিক পরিবর্তন বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা—

i. জীবের প্রতি অহিংসা মনোভাব পোষণ করা

ii. সব সময় কুশল চিন্তা করা

iii. প্রাণীর প্রতি গভীর স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিজয় চাকমা শহরে যাওয়ার সময় দেখলেন এক পথশিশু গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তিনি হাসপাতালে নিয়ে শিশুটিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে শিশুটি সুস্থ হলে তাকে মায়ের হাতে তুলে দেন।

ক. সিদ্ধার্থ চতুর্থ দিন নগর ভ্রমণে গিয়ে কী দেখলেন?
খ. ছেলে ও বউয়ের মনোভাব কীভাবে পরিবর্তন হলো? ব্যাখ্যা কর?
গ. বিজয় চাকমার আচরণে সিদ্ধার্থের কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত গুণের ফলে বিজয় চাকমার মন থেকে কী দূরীভূত হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২. **ঘটনা-১**

রতন বড়ুয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ভন্তে দেশনা করলেন– জগতের সবকিছুই অনিত্য ও দুঃখময়। জন্মের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না।

ঘটনা-২

জয় চাকমা বনবিহারে গিয়ে ভিক্ষু-সংঘের পিণ্ডাচরণ দেখে ও সূত্রপাঠ শুনে মুগ্ধ হলেন। নিজের জীবনের পরিবর্তন উপলব্ধি করেন। একপর্যায়ে সংসারের প্রতি তাঁর অনীহা এলো। তিনি মা-বাবার অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হলেন।

ক. বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৌতম কী লাভ করলেন?
খ. সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. ঘটনা-১-এর উদ্ধৃতাংশটি পাঠ্যবইয়ের চারি নিমিত্তের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ঘটনা-২-এ জয় চাকমার অনুসৃত পথের ফলাফল ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্দনা

'বন্দনা' বৌদ্ধদের নিত্য পালনীয় একটি কর্ম। বন্দনা হলো গুণরাশি স্মরণ ও অনুকরণ করার প্রক্রিয়া বিশেষ। ধার্মিক, জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তি বন্দনার যোগ্য। মানবচিত্ত সবসময় লোভ-দ্বেষ-মোহাদি পাপে লিপ্ত থাকে। বন্দনা মানুষের মনের কালিমা বিদূরিত করে এবং ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করে। বুদ্ধ বলেছেন, শ্রদ্ধার দ্বারা মহাপ্লাবন অতিক্রম করা যায়। মানবশিশুর বৃদ্ধির জন্য মাতৃদুগ্ধ যেমন খুবই দরকার, তেমনি চিত্তের বিকাশ লাভ করার জন্য প্রতিদিন বন্দনা করা আবশ্যক। এ অধ্যায়ে বন্দনার সুফল, নিয়মাবলি, দন্তধাতু, সপ্ত মহাস্থান এবং মাতৃ-পিতৃ বন্দনা সম্পর্কে পড়ব।

বন্দনারত উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* বন্দনা সম্পর্কে বলতে পারব।
* বন্দনা করার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
* বন্দনার সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বন্দনা ও বন্দনার সুফল

বন্দনা

'বন্দনা' শব্দের বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। যেমন : প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, প্রেম, শ্রদ্ধা নিবেদন, অভ্যর্থনা, আরাধনা, উপাসনা, স্তুতিগান ইত্যাদি। মূলত গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের গুণরাশির স্তুতি করাই হচ্ছে বন্দনা।

'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ মহাজ্ঞানী। তিনি ছিলেন মানবপুত্র। তাঁকে মহামানব বলা হয়। তাছাড়া তিনি অসীম গুণরাশির অধিকারী ছিলেন। তাই আমরা বুদ্ধের বন্দনা করি। বন্দনার উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের অসীম গুণের স্তুতি বা প্রশংসা করা। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে নিজের জীবনকে সুন্দর করা।

আমরা শুধু বুদ্ধকে বন্দনা করি না। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে বন্দনা করি। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মহান সঙ্ঘকেও বন্দনা করি। আমরা বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা করি। সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা করি। বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করি। চৈত্যকে বন্দনা করি। বিভিন্ন তীর্থস্থান ও পবিত্র স্থানকে বন্দনা করি। মা-বাবার বন্দনা করি। বন্দনা বৌদ্ধদের নিত্যপালনীয় কর্ম।

বন্দনা বৌদ্ধবিহারে কিংবা বাড়িতে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে করা যায়। বিহার যদি বাড়ির কাছে হয় তাহলে বিহারে গিয়ে বন্দনা করলে ভালো হয়। আর বিহার যদি দূরে হয় সে ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিহারে গিয়ে বন্দনা করা ভালো। মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বন্দনা করা মঙ্গল। এ ধরনের বন্দনাকে সমবেত প্রার্থনা বলা হয়। সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়। মায়া-মমতা বৃদ্ধি পায়। সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সুদৃঢ় হয়।

বন্দনার সুফল

মানবজীবনে বন্দনার প্রভাব অপরিসীম। বন্দনার সুফল অনেক। বন্দনার মাধ্যমে মন পবিত্র হয়। পুণ্য লাভ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হয়। অশান্ত মন শান্ত ও সংযত হয়। লোভ, দ্বেষ এবং মোহ দূরীভূত হয়। অকুশল ও অন্যায় কাজ করার ইচ্ছা জাগে না। মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত হয় এবং সত্য কথা বলতে উৎসাহী হয়। মনে সৎ চিন্তা আসে। ভালো কাজে উৎসাহ আসে। ধৈর্য ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে। অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা জাগে। উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। ইহলোক এবং পরলোকে সুখ লাভ হয়। বন্দনায় হৃদয়ে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। তাই সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রতিদিন বন্দনা করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

বন্দনা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

পাঠ : ২

বন্দনার নিয়মাবলি

বন্দনা করার আগে এবং বন্দনা করার সময় বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেমন : বন্দনার আগে ভালো করে মুখ, হাত ও পা ধুয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে হয়। এতে দেহ ও মন পবিত্র হয়। পবিত্র দেহমনে বন্দনা করলে একাগ্রতা বাড়ে। বন্দনার সময় বুদ্ধমূর্তি কিংবা বুদ্ধের ছবির সামনে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়। তারপর দুই হাতের তালু যুক্ত করে মনোযোগ সহকারে সুর করে বন্দনার গাথা আবৃত্তি করতে হয়। আবৃত্তি স্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রত্যেক বন্দনাগাথা আবৃত্তি করার পর ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

বালক-বালিকা প্রণাম নিবেদন করছে

এখন বুদ্ধের দন্তধাতু, সপ্ত মহাস্থান এবং মাতৃ-পিতৃবন্দনা শিখব।

পাঠ : ৩

বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা

বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। দন্তধাতু তন্মধ্যে অন্যতম। চারটি স্থানে বুদ্ধের দন্তধাতু যত্নসহকারে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। দন্তধাতু বন্দনার পালি গাথাটি নিম্নরূপ :

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে অহু

একা গান্ধার বিসযে, একাসি পুন সীহলে,

চতস্‌সো তা মহাদাঠা নিব্বান রসদীপিকা

পূজিতা নরদেবেহি, তাপি বন্দামি ধাতুযো।

বাংলা অনুবাদ : বুদ্ধের একটি দন্ত ত্রিদশালয়ে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, একটি সিংহল দ্বীপে রয়েছে। নির্বাণ রস প্রদানকারী এ চারটি মহাদন্ত নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত। আমিও সেই চার দন্তধাতুকে ভক্তিসহকারে বন্দনা করছি।

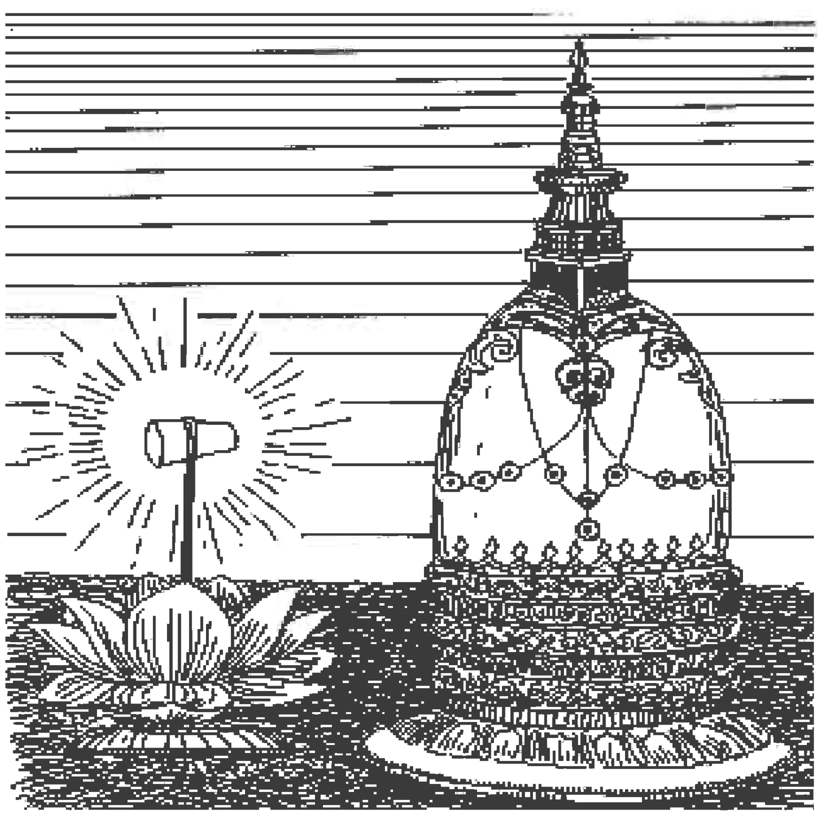

পাত্রে রক্ষিত বুদ্ধের দন্তধাতু

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনাটি সমবেতভাবে আবৃত্তি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের পাশে সাতটি স্থানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। সেসময় তিনি কখনো ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কখনো পদচারণ করেছেন। কখনো তাঁর উদ্ভাবিত নবধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। বোধি বৃক্ষের চারিপাশে এ রকম সাতটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সাতটি স্থানকে সপ্ত মহাস্থান বলা হয়। সপ্ত মহাস্থান হলো :

বোধিপালঙ্ক : বুদ্ধ যে আসনে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন তাকে বোধিপালঙ্ক বলা হয়।

অনিমেষ স্থান : বোধিপালঙ্ক থেকে কিছুটা উত্তর-পূর্ব কোণে অনিমেষ স্থান অবস্থিত। অনিমেষ স্থানে বসে বুদ্ধ সাত দিন ধরে এক পলকে বোধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য এ স্থান অনিমেষ চৈত্য নামে পরিচিত।

চংক্রমণ স্থান : বোধিপালঙ্ক ও অনিমেষ স্থানের মাঝখানে যে বেদীটি দেখা যায়, তা চংক্রমণ (পদচারণ) স্থান নামে অভিহিত। বুদ্ধ এখানে চংক্রমণ করেছিলেন বলে এরূপ নামকরণ হয়।

রত্নঘর : বোধিপালঙ্কের সোজা উত্তর-পশ্চিম পাশের সামান্য দূরে রত্নঘর স্থান অবস্থিত। বুদ্ধ এ স্থানে বসেই ধ্যান করেছিলেন।

অজপাল ন্যাগ্রোধ : এটি বোধিপালঙ্কের সোজা পূর্বদিকে এবং অনিমেষ স্থানের কিছু দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। ছাগল পালকেরা এ বৃক্ষের নিচে বসতো বলেই এটি অজপাল বৃক্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ এ স্থানে ধ্যান করতেন।

মুচলিন্দ স্থান : বোধিপালঙ্কের দক্ষিণ-পূর্বে এটি অবস্থিত। এখানে নাগরাজের বসবাস ছিল। মুচলিন্দ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করার সময় নাগরাজ তাঁর দেহ দিয়ে বুদ্ধকে বেষ্টন করে মশা-মাছি, ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি থেকে রক্ষা করেছিলেন।

রাজায়তন স্থান : বোধিপালঙ্কের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এবং মুচলিন্দের উত্তর পাশে এটির অবস্থান। রাজায়তন নামে এক ধরনের পার্বত্য বৃক্ষ ছিল বলেই এটি রাজায়তন স্থান নামে পরিচিত। এখানেও বুদ্ধ সাত দিন যাবৎ ধ্যান করেন।

বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই সপ্ত মহাস্থান বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। তাই বৌদ্ধরা একাগ্রচিত্তে এই সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা নিবেদন করে। সপ্ত মহাস্থান বন্দনা গাথাটি নিম্নরূপ :

পঠমং বোধিপল্লঙ্কং, দুতিযং অনিমিসম্পি চ

ততিযং চঙ্কমণং সেট্ঠং, চতুত্থং রতনঘরং

পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং

সত্তমং রাজাযতনং, বন্দে তং বোধিপাদপং।

বাংলা অনুবাদ : প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চংক্রমণ স্থান, চতুর্থ রতনঘর স্থান, পঞ্চম অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ মূল, সপ্তম রাজায়তনসহ বোধিবৃক্ষকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ
সাতটি মহাস্থানের নাম বল

পাঠ : ৫

মাতৃ-পিতৃবন্দনা

মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির নিকট পরম পূজনীয়। মাতা-পিতা না থাকলে আমরা এই অপরূপ পৃথিবীর সৌন্দর্য কখনো দেখতে পেতাম না। স্নেহময়ী মাতা পুত্র-কন্যাদের দশ মাস গর্ভে ধারণ করে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। তারপর সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান। পিতা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ এবং পরম মায়া-মমতায় লালন-পালন করেন। পিতা-মাতা সব সময় সন্তান-সন্ততির মঙ্গল কামনা করেন। এ মহান হিতকামী মাতা-পিতাকে বৌদ্ধরা শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা জ্ঞাপন করেন। নিচে মাতৃ-পিতৃবন্দনা গাথা দেওয়া হলো :

মাতৃবন্দনা
কত্বান কাযে রুধিরং খীরং যা সিনেহ পূরিতা
পাযেত্বা মং সংবড্ঢেসি বন্দে তং মম মাতরং।

বাংলা অনুবাদ : যে জননী রক্তসঞ্জাত স্নেহসিক্ত স্তন্য পান করিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন, সেই মমতাময়ী মাতাকে আমি বন্দনা করছি।

পিতৃবন্দনা
দযায পরিপুণ্ণোব জনকো যো পিতা মম
পোসেসি বুদ্ধিং কারেসি বন্দে তং পিতরং মম।

বাংলা অনুবাদ : দয়ায় পরিপূর্ণ যে পিতা আমাকে ভরণ-পোষণ করেছেন এবং আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত করেছেন, সেই পিতাকে আমি বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ
মাতৃ-পিতৃবন্দনা আবৃত্তি কর (দলীয় কাজ)।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বন্দনায় হৃদয়ে ....জাগ্রত হয়।
২. তিনি অসীম ....গুণরাশির অধিকারী ছিলেন।
৩. বুদ্ধ প্রবর্তিত ....বন্দনা করি।
৪. মা-বাবা সন্তান-সন্ততির নিকট পরম .... ।
৫. বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু বৌদ্ধদের নিকট অতি .... ।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে	বন্দনা করলে একাগ্রতা বাড়ে
২. মা-বাবা সব সময়	স্পষ্ট হওয়া উচিত
৩. পবিত্র দেহ-মনে	দন্তধাতু বন্দনা করি
৪. আবৃত্তি	পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়
৫. আমরা বুদ্ধের	সন্তান-সন্ততির মঙ্গল কামনা করেন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বন্দনা বলতে কী বুঝ?
২. বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনাটি বাংলায় লেখ।
৩. সমবেত বন্দনা বলতে কী বুঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বন্দনার সুফলসহ বন্দনার নিয়মাবলি আলোচনা কর।
২. মাতৃবন্দনা ও পিতৃবন্দনা বাংলা অনুবাদসহ আলোচনা কর।
৩. সপ্ত মহাস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী?

ক. জ্ঞানী
খ. মহাজ্ঞানী
গ. লৌকিক জ্ঞান
ঘ. সাধারণ জ্ঞান

২. মানবজীবনে বন্দনার প্রভাব অপরিসীম, কারণ এতে—

i. মায়া-মমতা বৃদ্ধি পায়
ii. মন পবিত্র হয়
iii. পুণ্য সঞ্চয় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রতন বড়ুয়া পরিবার-পরিজন নিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বিহারে গিয়ে প্রথমে বুদ্ধপূজা করেন। এরপর ভন্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একসাথে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন।

৩. রতন বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডকে কোন ধরনের বন্দনা বলা যায়?

ক. সমবেত বন্দনা খ. একক বন্দনা
গ. দন্তধাতু বন্দনা ঘ. সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

৪. বৌদ্ধধর্ম অনুসারে উক্ত কর্মের ফলাফলে—

i. পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়
ii. বিত্তশালী হওয়া যায়
iii. সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সুদৃঢ় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

নৈরঞ্জনা নদীর তীরে ধ্যানরত অবস্থায় গৌতম বুদ্ধ

ক. বুদ্ধের কয়টি মহাদন্ত ধাতু নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত?

খ. 'রাজায়তন' নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রে প্রদর্শিত বুদ্ধের অবস্থান সপ্ত মহাস্থানের কোনটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত স্থানটি বন্দনা করলে কী সুফল পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

২. প্রত্যয় বড়ুয়া ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাগানে ফুল তোলে। ফুলগুলো বুদ্ধের মূর্তি বা ছবির সামনে রেখে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সন্ধ্যা হলে সে বুদ্ধের সম্মুখে মোমবাতি ও ধূপ দিয়ে পূজা করে। তার আচরণে সবাই মুগ্ধ।

ক. রত্নঘর স্থান কোথায় অবস্থিত?

খ. মা-বাবাকে কেন শ্রদ্ধ চিত্তে বন্দনা করা উচিত? ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রত্যয় বড়ুয়ার আচরণকে বৌদ্ধ পরিভাষায় কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত আচরণে প্রত্যয় বড়ুয়া ইহলোক ও পরলোকে কী ফল ভোগ করবে? ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
শীল

বৌদ্ধধর্মে নিয়ম ও শৃঙ্খলার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শীল নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তি। তাই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের শীল পালন একান্ত কর্তব্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে গৃহী ও ভিক্ষুদের বিভিন্ন রকম শীল পালনের নির্দেশ আছে। সুন্দর ও পবিত্র জীবন গঠনের জন্য শীল পালন করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা নিত্যপালনীয় শীল, শীল গ্রহণের নিয়মাবলি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–
* শীল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
* শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
* বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় পঞ্চশীল বলতে পারব।
* পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ : ১

শীল পরিচিতি

'শীল' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা চরিত্র। শীলের আরো অর্থ আছে। যেমন : নিয়ম, নীতি, সংযম, সদাচার, আশ্রয়, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমকে শীল বলা হয়। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য শীল পালন অপরিহার্য। গৌতম বুদ্ধ মানুষের চরিত্র সুন্দর করার জন্য শীল পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত শীল পালনের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা অনুশীলন করতে পারি। যাঁরা শীল পালন করেন তাঁদেরকে বলা হয় শীলবান।

শীল দশ প্রকার। তার মধ্যে পঞ্চশীল গৃহীরা পালন করেন। যাঁরা উপোসথ গ্রহণ করেন তাঁরা অষ্টশীল পালন করেন। তাই অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। শ্রমণগণ দশশীল পালন করেন। এজন্য দশশীলকে প্রব্রজ্যাশীল বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ
শীল শব্দের অর্থ লেখ

পাঠ : ২

নিত্যপালনীয় শীল

যে শীলগুলো প্রতিদিন পালন করতে হয় সেগুলোকে নিত্যপালনীয় শীল বলা হয়। পঞ্চশীল নিত্যপালনীয় শীল। এগুলো পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থান নেই। সব সময় সর্বত্র পালন করা যায়।

পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। প্রাণী হত্যা মহাপাপ। প্রাণী হত্যা করলে জন্ম-জন্মান্তরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্রত্যেকে নিজের জীবনকে ভালোবাসে। তাই কোনো প্রাণীকে আঘাত এবং হত্যা করা উচিত নয়। প্রথম শীলটি দ্বারা কেবল প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা বোঝায় না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শিক্ষাও দেয়। এই শীলটি ছোট-বড়, হীন-উত্তম, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সকল প্রাণীকে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয়টি চুরি বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। চুরি একটি সামাজিক অপরাধও বটে। চুরি করলে সাজা এবং দণ্ড ভোগ করতে হয়। সুনাম নষ্ট হয়। পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে। তাই চুরি বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর বই, খাতা, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি না বলে গ্রহণ করা অনুচিত। পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীলটি মানুষকে কেবল চুরি বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত রাখে না, অধিকন্তু সৎ উপায়ে নিজের পরিশ্রমে অর্জিত বস্তু বা অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে শিক্ষা দেয়। লোভহীন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয় শীলটি কামাচার বা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই শীলটি মানুষকে অনৈতিক আচার-আচরণ পরিহারপূর্বক নৈতিক জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ হয়।

চতুর্থ শীলটি মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মিথ্যাবাদীকে সকলে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে না। যারা মিথ্যা কথা বলে তারা সর্বত্র নিন্দিত হয়। এই শীলটি মানুষকে কর্কশ, অপ্রিয়, অশ্লীল, কটু, অসার কথা, পরনিন্দা এবং সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। ফলে কায়, বাক্য এবং মন পরিশুদ্ধ হয়।

পঞ্চম শীলটি সুরা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিবেক, বুদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ এবং সম্মান নষ্ট হয়। মাদক গ্রহণকারী নানারকম পাপকর্মে লিপ্ত থেকে মানুষের ক্ষতি সাধন করে। এমনকি দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। মাদক গ্রহণকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তারা ইহকালে যেমন কষ্ট পায় তেমনি মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। মাদকদ্রব্যের মতো ধূমপানও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই সকলের মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ
পঞ্চশীলের পঞ্চম শীলটি ব্যাখ্যা কর

পাঠ : ৩
শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

শীল হচ্ছে সমস্ত কুশলধর্মের আদি। শীল রক্ষা কবচ। মানবজীবনে শীল অমূল্য সম্পদ। শীল পালন ব্যতীত নিজেকে কখনো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। জীবনকে সুন্দর পথে পরিচালিত করা যায় না। নৈতিক জীবনযাপন করা যায় না। শীল পালন না করলে বিচার, বিবেচনা ও বুদ্ধি লোপ পায়। নিজের এবং অপরের মঙ্গল ও কল্যাণসাধনে শীলের মতো আর কিছুই নেই। শীল পালনের মাধ্যমে মন শান্ত হয়। মন শান্ত হলে সকল প্রকার অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়। এই শীল মানুষকে মহান ও শ্রেষ্ঠ করে তোলে। শীল পালনের মাধ্যমে পরিবারে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় তেমনিভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি আর সদ্ভাবও সুদৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনা বৃদ্ধি পায়। যা কুশল, সত্য এবং সুন্দর তা সবই শীলে রয়েছে। যাঁরা নিজের জীবনকে মহৎ করে তুলেছেন তাঁরা সবাই শীল পালন করেছেন। সুতরাং শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ
শীল মানবজীবনে কী পরিবর্তন সাধন করে?

পাঠ : ৪
পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়মাবলি

পঞ্চশীল গ্রহণ করার আগে অবশ্যই মুখ, হাত ও পা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে মন পবিত্র হয়। শান্ত হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ করার সময় করজোড়ে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়।

ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন

পাঠ : ৫

পঞ্চশীল প্রার্থনা (পালি ও বাংলা)

পঞ্চশীল গ্রহণের পূর্বে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। পালিতে প্রার্থনাগাথাটি এরূপ :

পঞ্চশীল প্রার্থনা (পালি)

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
দুতিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
ততিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

শেখার কৌশল

১. দুতিযম্পি বলে গাথাটি পুনরায় বলতে হবে।
২. ততিযম্পি বলে গাথাটি পুনরায় বলতে হবে।
৩. একজন প্রার্থনা করলে 'অহং' এবং বহুজনে মিলে প্রার্থনা করলে 'অহং' এর পরিবর্তে 'মযং' বলতে হবে। অনুরূপভাবে, একজন প্রার্থনা করলে 'যাচামি', বহুজনে করলে 'যাচাম' হবে।

বাংলা অনুবাদ :

ভন্তে আমাকে অনুমতি দিন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।
দ্বিতীয়বার ....।
তৃতীয়বার ....।

ভিক্ষু : যমহং বদামি তং বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন)।
শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে বলছি)
ভিক্ষু : নমোতস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স (আমি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি)।
শীল গ্রহণকারী : নমোতস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স (তিনবার বলতে হবে)।
এরপর ভিক্ষু ত্রিশরণ গ্রহণ করতে বলবেন।

ত্রিশরণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি)।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি (আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি)।
সংঘং সরণং গচ্ছামি (আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি)।

দুতিযম্পি ....
ততিযম্পি ....

ভিক্ষু : সরণাগমনং সম্পন্নং (শরণে গমন বা শরণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে)।
শীল প্রার্থনাকারী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে)।
তারপর ভিক্ষু পঞ্চশীল প্রদান করবেন এবং শীলগ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন।

পাঠ : ৬

পঞ্চশীল (পালি ও বাংলা)

পঞ্চশীল (পালি)

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ :

আমি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
আমি সুরা এবং মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ

পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা করে দেখাও (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৭

পঞ্চশীল পালনের সুফল

শীল পালনের সুফল অনেক। যেমন : শীল–

১) হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা ও মাদক গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।
২) মানুষের মনের কালিমা দূর করে।
৩) মনকে শান্ত ও সংযত করে।
৪) চরিত্র সুন্দর করে।
৫) কথা বলায় সংযত করে।
৬) বিনয়ী ও ভদ্র করে।
৭) অনৈতিক ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে।
৮) সৎকাজে উৎসাহিত করে।

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, 'ফুলের গন্ধ কেবল বাতাসের অনুকূলে যায়, প্রতিকূলে যায় না। কিন্তু শীলবান ব্যক্তির প্রশংসা বাতাসের অনুকূলে যেমন যায় তেমনি প্রতিকূলেও যায়। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি অকুশলকর্ম ব্যক্তিজীবনকে কলুষিত করে। কলুষিত ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। অপরদিকে শীলবান ব্যক্তি সকল প্রকার অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকেন। ফলে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। তাই সকলের শীল পালন ও অনুশীলন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. শীল শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা .... ।
২. যাঁরা শীল পালন করেন তাদেরকে বলা হয় .... ।
৩. পঞ্চশীল গ্রহণ করার সময় করজোড়ে .... ভেঙে বসতে হয়।
৪. এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে .... পবিত্র হয়।
৫. পঞ্চশীল .... শীল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শীল বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. পঞ্চশীল বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পঞ্চশীল প্রার্থনা বাংলা অনুবাদসহ লেখ।
২. পঞ্চশীলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শীল আলোচনা কর।
৩. পঞ্চশীলের সুফলসমূহ বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিত্যপালনীয় শীল কোনটি?

ক. পঞ্চশীল খ. অষ্টশীল
গ. দশশীল ঘ. অর্থশীল

২. শীল পালনের মাধ্যমে -

i. শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করা যায়
ii. চরিত্র সুন্দর ও পবিত্র করা যায়
iii. আর্থিক উন্নয়ন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিনুচিং মারমা স্কুলে তার বন্ধুদের ব্যাগ থেকে প্রায়ই না বলে কখনো কলম, কখনো পেন্সিল, কখনো খাতা নিয়ে যায়। এতে তার বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা হয় না।

৩. মিনুচিং মারমা পঞ্চশীলের কোন নীতি লংঘন করে?

ক. মিথ্যা কথা খ. অদত্ত বস্তু গ্রহণ
গ. ব্যভিচার ঘ. মাদক গ্রহণ

৪. উক্ত আচরণের পরিবর্তনের ফলে মিনুচিং মারমা সুফল লাভ করবে -

i. লোভহীন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে
ii. শান্ত ও সংযত হবে
iii. বিনয়ী ও ভদ্র হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রীতিময় চাকমা একজন সফল কৃষক। কৃষিপণ্য বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করে থাকেন। পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি করার সময় কখনও ছলচাতুরী, মিথ্যা কিংবা প্রতারণার আশ্রয় নেন না। উন্নত ও মহৎ জীবনযাপনের জন্য তিনি ধর্মীয় নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর আচরণে গ্রামবাসী মুগ্ধ।

ক. শীল কয় প্রকার?

খ. নিত্যপালনীয় শীল বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রীতিময় চাকমা যে শীল পালন করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত শীল পালনের দ্বারা প্রীতিময় চাকমা কী ফলভোগ করতে পারেন, পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. প্রতিমা বড়ুয়া একজন পুণ্যবতী মহিলা। তিনি প্রতিদিন বিহারে গিয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বন্দনা করেন। তিনি প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথা বলা ও মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে যথাযথভাবে শীল পালন করেন।

ক. শীল শব্দের অর্থ কী?

খ. নিত্যপালনীয় শীলের প্রার্থনা পালি কিংবা বাংলায় উল্লেখ কর।

গ. প্রতিমা বড়ুয়াকে কোন ধরনের উপাসিকা বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিমার আচরণ জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ করবে—উত্তরের সপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

দান

মানুষ যেসব ভালো কাজ করে তার মধ্যে 'দান' অন্যতম। দান বলতে সাধারণত শর্তহীনভাবে অন্যকে কিছু দেওয়া বোঝায়। যেমন, শীতের সময়ে যাদের ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য গরম কাপড় নেই তাদেরকে গরম কাপড় বিনামূল্যে দেওয়া। কোনো অসুস্থ মানুষকে প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া একটি শর্তহীন দানের উদাহরণ। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু দেওয়ার সময় বিনিময়ে অন্য কিছু আশা করি না এ রকম দেওয়া বা প্রদান করাকে দান বলা হয়। যিনি দান করেন বা দেন তাঁকে দাতা বলা হয়। আমরা আমাদের চারপাশে অনেককে দান করতে দেখি। দান একটি সেবামূলক কাজ। কারণ দানের উদ্দেশ্য অন্যের উপকার করা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, টাকা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিডনি, রক্ত, চোখ এমনকি জীবনও দান বা উৎসর্গ করা যায়। এজন্য 'দান' একটি মহৎ কর্ম। বৌদ্ধধর্মে 'দান' অন্যতম কুশলকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে দানের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। এই অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ দান সম্পর্কে পড়ব।

শীতবস্ত্র দান করছে

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* বৌদ্ধ দানের বৈশিষ্ট্য ও বিবেচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারব।
* বিভিন্ন প্রকার দানীয় বস্তুর বিবরণ দিতে পারব।
* দানের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১
বৌদ্ধধর্মে দান

যা দেওয়া হয় তা-ই দান। তবে 'দান' নিঃস্বার্থ ও শর্তহীন। যিনি দান করবেন তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেবেন। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্যদান কিংবা শীতার্ত ব্যক্তিকে বস্ত্রদান করে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করা হয় না। এখানে দাতার কোনো স্বার্থ নেই। আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করে থাকি। এরূপ দান নিঃস্বার্থ। আমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ, সেবা, রক্ত, আর্থিক সহায়তা দান করে থাকি। এখানেও দাতার স্বার্থ থাকে না। বৌদ্ধধর্মে শুধু মানুষের দান নয়, পশু-পাখির দান কাহিনীও আছে, যা বুদ্ধের জীবনী ও জাতক পড়ে জানা যায়। যেমন, বুদ্ধ যখন পারলেয়্য বনে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁকে বানর ও হাতি মধু ও ফল দান করত। দানকর্মের জন্য তারা বৌদ্ধ সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই, তবে দেখি যে, গাছ আমাদের ছায়া দান করে; ফুল সৌন্দর্য ও সুরভি অকাতরে দান করে; নদী তার সুমিষ্ট জল অকৃপণভাবে দান করে। পরের জন্য এই অকাতর দান থেকে আমরা দানের মহত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান

বৌদ্ধধর্মে 'দান' -এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা শুধু মানুষকে দান করেন না, পশুপাখি এবং অদৃশ্য প্রাণীদেরও দান করেন। বৌদ্ধধর্মে মৈত্রী দান করা যায়। 'মৈত্রী' হচ্ছে সকলের ভালো হোক এরূপ প্রার্থনা করা। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী দান বৌদ্ধধর্মে দানের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দান শুধু সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। ধনী ব্যক্তি যদি অনেক কিছু দান করেন কিন্তু চিত্তের পবিত্রতা বা মৈত্রীপূর্ণ দান চেতনা না থাকে সে দানও যথার্থ হয় না। বিশেষত বৌদ্ধদের দান দেওয়ার সময় দানীয় বস্তু, দাতা ও দান গ্রহীতার গুণাগুণ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। দানীয় বস্তুর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ : ১। বস্তু সম্পত্তি ২। চিত্ত সম্পত্তি ৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি

বস্তু সম্পত্তি : সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি দান করা উচিত। এতে বেশি ফল লাভ করা যায়। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা বস্তু দান করলে তাকে উত্তম দান বলা হয়। তাই সৎ উপায়ে অর্জিত দানীয় বস্তুকে বস্তু সম্পত্তি বলা হয়।

চিত্ত সম্পত্তি : দান করার সময় মৈত্রীপূর্ণ কুশল চেতনা নিয়ে দান করতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন, চেতনা থেকে উৎপন্ন সৎ কাজই উত্তম কর্ম। লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, মোহ ও সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে দান করার ইচ্ছাই চিত্ত সম্পত্তি। এরূপ দানই উত্তম দান।

প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি : শীল পালন দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দান ও শীলে প্রতিষ্ঠিত দান গ্রহীতার ওপর দানের সুফল নির্ভর করে। শীলবান দান গ্রহীতা হচ্ছেন দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। অর্থাৎ দান করার সময় দানের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত করা উচিত। নৈতিক চারিত্রিক গুণসম্পন্ন শীলবান ব্যক্তিকে দান করলে তা উত্তম দান বলে বিবেচিত হয়। শীলবান গ্রহীতাকে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলা হয়।

দাতার বৈশিষ্ট্য :

১। দান ও দানফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

২। দানীয় বস্তু ও গ্রহীতার প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। দাতার নিজের হাতে দান করা উচিত।

৩। কৃপণতা ও অনুরাগ বর্জন করে উদার চিত্তে দান করা উচিত।

৪। সঠিক সময়ে উপযুক্ত পাত্রে দান করা উচিত।

৫। দানের সময় নিজেকে উত্তম ভেবে গ্রহীতাকে অধম মনে করা উচিত নয়।

দাতার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে দাতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন :

১। দান দাস

২। দান সহায়

৩। দানপতি

দানদাস : যে দাতা নিজে যা খান তার চেয়ে খারাপ খাবার দান করেন তাকে দানদাস বলা হয়।

দানসহায় : যে দাতা নিজে যেরূপ খান অপরকে সেরূপ দান করেন তাকে দানসহায় বলা হয়।

দানপতি : যে দাতা নিজে সংযম পালন করে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেন তিনি দানপতি।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

দান করতে হলে দাতার কী কী গুণ থাকতে হবে, উল্লেখ কর

পাঠ : ২
দানীয় বস্তু

ছোট-বড় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৌদ্ধরা দান করে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান একক বা যৌথভাবে পালন করা যায়। তবে পরিকল্পিত অনুষ্ঠান ছাড়াও দান করা যায়। যা দান করা হয় তাকে বলা হয় দানীয় বস্তু। কী কী দান করা যায় এ বিষয়ে পালি গাথায় দশ রকমের বস্তুর বর্ণনা আছে।
যেমন :

অন্নং পানং বথুং যানং

মালা গন্ধ বিলেপনং

সেয়্যা বসথ পদীপেয্যং

দা নকযু ইযে দসা।

বাংলা অনুবাদ : অন্ন, জল, বস্ত্র, যানবাহন, মালা বা পুষ্প, সুগন্ধ বা সুরভি, বিলেপন বা শরীর পরিষ্কার করার জিনিস, গৃহ, শয্যাসামগ্রী, প্রদীপ ইত্যাদি উত্তম দানীয় বস্তু। এছাড়া বুদ্ধের জীবনী, জাতক ও নীতিগাথায় দানের কাহিনী বর্ণিত আছে, যা থেকে আমরা দানীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

'বেস্সান্তর' জাতকে উল্লেখ আছে যে, রাজা বেস্সান্তর নিজের রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব দান করে অবশেষে নিজেকেও দান করেছিলেন। এভাবেই তিনি দান পারমী পূর্ণ করেন। শিবি জাতকে শরীর ও চক্ষু দানের উল্লেখ আছে। দাসী পূর্ণা নিজের খাদ্য পোড়া রুটিখানা শ্রদ্ধাভরে এক শ্রমণকে দান করেছিলেন। 'কুনাল' জাতকে পঞ্চপাপা এক শ্রমণকে একতাল মাটিও দান করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে অন্যের উপকার হয় এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুসংঘকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ দান করা হয়। বিপদে, দুর্যোগে বিপন্ন ও দুস্থ মানুষকে এমনকি অন্যান্য প্রাণীকেও প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা যায়। ঔষধসহ সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দানীয় বস্তু হতে পারে। তবে দানীয় বস্তু সৎভাবে উপার্জিত হতে হবে। পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি অর্জিত পুণ্যরাশিও বৌদ্ধরা দান করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশনা করার সময় উপাসক ও উপাসিকাদের পুণ্য দান করেন। বৌদ্ধ নর-নারীগণ অর্জিত পুণ্যরাশি জীবিত, মৃত আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু, জানা-অজানা জ্ঞাতিবর্গ, দেবতা ও প্রেতগণ এমনকি শত্রুর উদ্দেশ্যেও দান করেন। বৌদ্ধরা সকল প্রাণীর প্রতি 'সব্বে সত্তা সুখীতা ভবন্তু' বলে মৈত্রী দান করেন। আমরা জানি বিদ্যা অমূল্য ধন, বিদ্যা দান করলে তা আরও বাড়ে। বিদ্যার মতো পুণ্যফলও দান করলে ক্ষয় হয় না, আরও বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কী কী দান করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৩
দান কাহিনী

এখন আমরা বোধিসত্ত্বের একটি দান কাহিনী পড়ব। অনেক অনেক দিন আগে ভরত নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি যথাযথভাবে রাজধর্ম পালন করতেন। প্রজাদের সন্তান-স্নেহে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র, পথিক, ভিখারি ও যাচকদের মহাদানে সন্তুষ্ট করতেন। সমুদ্র বিজয়া নামে তাঁর এক পণ্ডিত ও জ্ঞানী রানি ছিলেন। একদিন রাজা তাঁর দানশালা পরিদর্শনের সময় ভাবলেন, "আমি যে দান করি তা অনেক সময় দুঃশীল ও লোভী লোকেরা ভোগ করে থাকে। এতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমি শীলবান, উত্তম দানের পাত্র প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে দান করতে চাই। কিন্তু তাঁরা তো হিমবন্ত প্রদেশে থাকেন। কীভাবে তাদের নিমন্ত্রণ করি?" তিনি বিষয়টি রানির সঙ্গে আলোচনা করলেন। রানি বললেন, "মহারাজ, কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা দান, শীল ও সত্য বলে পুষ্প পাঠিয়ে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে নিমন্ত্রণ করব এবং তাঁরা আগমন করলে অষ্টপরিষ্কার যুক্ত দান দেব।" রাজা প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে শীল পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনিও পরিবার পরিজনসহ শীল পালন এবং মহাদান করতে থাকলেন। সোনার পাত্রে ফুল নিয়ে তিনি প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। এরপর ভূমিতে পূর্বমুখী হয়ে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করে পূর্ব দিকে যে সকল অর্হৎ আছেন সকলকে প্রণাম করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ থাকলে তাঁদেরকে ভিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ করলেন। এরপর সাতমুষ্টি ফুল নিক্ষেপ করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ ছিলেন না বলে পরদিন কেউ এলেন না।

এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রত্যেকবুদ্ধদের প্রতি পুষ্প নিক্ষেপ করলেন। নমস্কার করে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে উত্তর দিকে একইভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তর-হিমালয়ে বসবাসকারী প্রত্যেকবুদ্ধগণের গুহায় রাজা প্রেরিত পুষ্প পৌঁছে গেল। তাঁদের শরীরে সেই ফুলগুলো পতিত হলো। তাঁরা চিন্তা করে জানতে পারলেন রাজা ভরত তাঁদের নিমন্ত্রণ করছেন। তখন তাঁরা সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধকে রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন। এই সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে রাজদ্বারে এসে পৌঁছলেন। রাজা প্রত্যেকবুদ্ধগণকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অতি সমাদরে তাঁদের রাজগৃহে নিয়ে গেলেন। অনেক আপ্যায়ন করলেন। অনেক দান করলেন। পরদিনের জন্য আবারও নিমন্ত্রণ করলেন। এভাবে ছয়দিন পর্যন্ত এঁদের ভোজন ও মহাদান পর্ব শেষে সপ্তম দিনে অষ্টপরিষ্কার দানের আয়োজন করলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণের মধ্যে যিনি প্রধান স্থবির তিনি দান অনুমোদন করে এরূপ উপদেশ প্রদান করলেন, "দান ফলই কেবল আমাদের কাজে আসে। গৃহ, অর্থ সম্পদ, দেহ, বল সবই ক্ষয়যোগ্য।" অতঃপর 'অপ্রমত্ত' হতে উপদেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অবশিষ্ট ভিক্ষুরাও নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করে চলে গেলেন :

'যিনি ধার্মিক এবং শীলবান তাঁর দানফল মরণের পরও তাঁকে অনুসরণ করে। অল্প দানেও মহাফল হয়, যদি তা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। উর্বর ভূমিতে চারা রোপণ করলে যেমন উত্তম ফসল পাওয়া যায়, সেরূপ শীলবান ও উত্তম ব্যক্তিকে দান করলে মহাফল অর্জিত হয়। দান প্রশংসনীয় কাজ। দান ও প্রজ্ঞাবলে নির্বাণ লাভ সম্ভব।"

অতঃপর, রাজা ও রানি আজীবন দানব্রতে রত থেকে স্বর্গ লাভ করেন। ঐ রাজা ভরত ছিলেন বোধিসত্ত্ব এবং রানি সমুদ্র বিজয়া ছিলেন গোপাদেবী। এই কাহিনী শেষে গৌতম বুদ্ধ বলেন, 'জ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও বিবেচনা করে দান করতেন।'

পাঠ : ৪

দানের সুফল

'দান' মানব জীবনের অন্যতম একটি মহৎ গুণ। ছোট-বড় সকল প্রকার দানেরই সুফল আছে। দানের সুফল অনেক। ধর্মগ্রন্থে সেসব সুফলের কথা বর্ণিত আছে। বৌদ্ধরা ধর্মীয়ভাবে যে দান অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সঙ্ঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান ও কঠিন চীবর দান উল্লেখযোগ্য। এসব দানের মাধ্যমে অনেক সুফল অর্জিত হয়। দানের মাধ্যমে দাতা অনেক পুণ্যফল অর্জন করেন। ধন ও যশ-খ্যাতি লাভ করেন। সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন। দীর্ঘজীবী হন। সর্বত্র প্রশংসিত হন। সকলের প্রিয় হন। অভাব ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন না। সুখে জীবন যাপন করেন। চিত্ত লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। তিনি দুর্গতি হতে মুক্তি লাভ করেন এবং সুগতি প্রাপ্ত হন। এছাড়া, দান পারমী পূর্ণ করার মাধ্যমে দাতা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তাই মহাকারুণিক বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের যথাসাধ্য দান করার উপদেশ দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মে একক দান অপেক্ষা সমবেত দানকে বেশি ফলদায়ক বলা হয়েছে। এজন্য অধিকাংশ দান অনুষ্ঠান যেমন, সঙ্ঘ দান, অষ্টপরিষ্কার দান, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে উদযাপিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ
দানের সুফলের একটি তালিকা প্রস্তুত কর

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. --------- হচ্ছে সকলের ভালো হোক এরূপ প্রার্থনা করা।

২. .... অর্জিত সম্পত্তিই দান করা উচিত।

৩. লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, মোহশূন্য ও সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে দান করার ইচ্ছাই .... ।

৪. জ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও ---- করে দান করতেন।

৫. দানের মাধ্যমে দাতা অনেক ------- অর্জন করেন।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যিনি দান করবেন	দান করলে মহাফল অর্জিত হয়
২. রাজা ও রানি আজীবন	বস্তু সম্পত্তি বলা হয়
৩. শীলবান ও উত্তম ব্যক্তিকে	তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেবেন
৪. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে	দানব্রতে রত থেকে স্বর্গ লাভ করেন
৫. সৎ উপায়ে অর্জিত দানীয় বস্তুকে	ভিক্ষু সঙ্ঘকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ দান করা হয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দাতা বলতে কী বুঝ? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. কী কী বস্তু সম্পদ দান করা যায়? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. কোন ধরনের দাতাকে দানদাস বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. দানপতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
২. দানের সুফলসমূহ আলোচনা কর।
৩. শীলবান ব্যক্তি উত্তম দানের পাত্র — ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে অন্যতম কুশলকর্ম কোনটি?

ক. মৈত্রী খ. শীল
গ. দান ঘ. ধ্যান

২. বৌদ্ধধর্মে দাতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

i. উপযুক্ত পাত্রে দান করা
ii. কৃপণতা পরিহার করা
iii. সময় বিবেচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অজয় মারমা একজন সৎ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাঁর ইচ্ছা হলো স্বর্গীয় মায়ের জন্য দান করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাই পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ দানীয় বস্তু ক্রয়ের জন্য ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করলেন।

৩. অজয় মারমার দানটিকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে কী বলা যায়?

ক. পুদগলিক দান খ. সঙ্ঘদান
গ. অষ্টপরিষ্কার দান ঘ. কঠিন চীবর দান

৪. এরূপ দানের দ্বারা স্বর্গীয় মায়ের কী উপকার হবে?

ক. সুগতি লাভ করবে
খ. মনুষ্য লোকে জন্ম নেবে
গ. নির্বাণ লাভ করবে
ঘ. ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিজলী বড়ুয়া একজন ধার্মিক উপাসিকা। তিনি প্রায়ই ভাবনা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ শেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন গুরু ভন্তেকে অষ্টপরিষ্কার দান করবেন। এ জন্য যথাসময়ে তিনি দানকার্য সম্পন্ন করেন।

ক. দাতা কাদেরকে বলা হয়?
খ. নিঃস্বার্থভাবে দান দেওয়া উচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. বিজলী বড়ুয়ার দানীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বিবেচনা করে দান করেছেন পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বিজলী বড়ুয়ার দানটি মহাফলদায়ক— উত্তরের সপক্ষে পাঠ্যবইয়ের আলোকে যুক্তি দাও।

২. অমল তালুকদার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন। একদিন মার্গলাভী ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করবেন বলে মনস্থির করলেন। সঞ্চিত অর্থ থেকে একটি উৎকৃষ্ট ও দামি পণ্য ক্রয় করলেন। অমল তালুকদারের দান দেখে শ্যামল তালুকদার পরিবারের অভাব-অনটন দূর করার জন্য এক দানীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

ক. কোন জাতকে শরীর ও চক্ষুদানের কথা উল্লেখ আছে?
খ. দানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
গ. অমল তালুকদারকে কোন ধরনের দাতা বলা যায় ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শ্যামল তালুকদারের দানটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

গৌতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানের সময় বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করেছেন। এসব সূত্র ও নীতিগাথায় মঙ্গলকর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশনা আছে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে মূলত নীতিগাথাসমূহ সংরক্ষিত আছে। এ অধ্যায়ে খুদ্দকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি, মঙ্গলসূত্র ও দুই বর্গের পটভূমি এবং বিষয়বস্তু পড়ব।

বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচে বসে শিষ্যদের সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করছেন

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* খুদ্দক পাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি প্রদান করতে পারব।
* মঙ্গল সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।
* বাংলা অর্থসহ মঙ্গল সূত্র বলতে পারব।
* কিসে মঙ্গল হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
* দণ্ডবর্গের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারব।
* মঙ্গল সূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষণীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১
খুদ্দক পাঠ ও ধর্মপদ পরিচিতি

বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। বুদ্ধ দেশিত সূত্রসমূহ ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে পাওয়া যায়। খুদ্দক পাঠ হচ্ছে সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ। 'খুদ্দক পাঠ' শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত পাঠ। খুদ্দক পাঠ গ্রন্থে মঙ্গল সূত্র পাওয়া যায়। ধর্মপদও খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রন্থ। ধর্মপদে বুদ্ধ ভাষিত বিভিন্ন গাথা পাওয়া যায়। ধর্মপদের অর্থ সঠিক পথ বা ধর্মের পথ। এ গ্রন্থের গাথাগুলো মানুষকে ধর্মের পথে বা সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই এ গ্রন্থের নাম ধর্মপদ। ধর্মপদে ২৬টি অধ্যায়ে ৪২৩টি গাথা আছে। এ অধ্যায়ে আমরা খুদ্দক পাঠের 'মঙ্গলসূত্র' এবং ধর্মপদের 'দণ্ডবর্গ' পড়ব।

অনুশীলনমূলক কাজ

খুদ্দক পাঠ ও ধর্মপদের পরিচয় দাও।

পাঠ : ২
মঙ্গলসূত্রের পটভূমি

মঙ্গল শব্দের অর্থ শুভ বা ভালো। আমরা নিজের ও অন্যের শুভ বা ভালো হোক কামনা করে থাকি। একে মঙ্গল কামনা বলে। অনেক সময়ই মনে প্রশ্ন জাগে, আসলে কিসে বা কী করলে মঙ্গল হয়? মানুষেরা নানা রকম আচরণ বা চিহ্নকে মঙ্গল ও অমঙ্গল সূচক মনে করে থাকে। যেমন, কোনো কাজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অনেকে ডান পা আগে বাইরে দেওয়াকে মঙ্গল মনে করে। অনেকে ভরা কলসসহ মেয়ে দেখলে মঙ্গল বা শুভ হয় বলে মনে করে। অনেকে কাক ডাকলে অশুভ হয় মনে করে ইত্যাদি।

গৌতম বুদ্ধের সময়েও লোকেরা কিসে মঙ্গল হয় তা নিয়ে আলোচনা করত। কেউ বলত, ভালো কিছু দেখলে মঙ্গল হয়। কেউ বলত, দেখার মধ্যে মঙ্গল নেই, শোনার মধ্যেই মঙ্গল। আবার, কেউ বলত, শোনার মধ্যে মঙ্গল নেই, মঙ্গল আছে ঘ্রাণ নেওয়ার মধ্যে, স্বাদ নেওয়ার মধ্যে কিংবা স্পর্শ করার মধ্যে। এভাবে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। মানুষের পাশাপাশি দেবতাদের মধ্যেও মঙ্গল নিয়ে তর্কবিতর্ক হতো। কিন্তু এতে কোনো সমাধান হলো না। তখন তাবতিংশ স্বর্গের দেবতারা একত্র হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের কথা শুনে একজন দেবপুত্রকে মর্ত্যলোকে ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করা জন্য পাঠালেন। ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। দেবপুত্রসহ অন্য দেবতারা বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে মঙ্গল কী জানতে চাইলেন। তার উত্তরে ভগবান বুদ্ধ দেবতা ও মানুষের উপকারের জন্য মঙ্গল সূত্র দেশনা করেন। তিনি মঙ্গলসূত্রে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলের কথা বলেন। এভাবেই 'মঙ্গলসূত্রের' উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ কেন মঙ্গলসূত্র দেশনা করেছিলেন?

পাঠ : ৩

মঙ্গলসূত্র (পালি ও বাংলা)

১. বহু দেবা মনুস্‌সাচ, মঙ্গলানি অচিন্তযুং

আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : বহু দেবতা ও মানুষ স্বস্তি কামনা করে কিসে মঙ্গল হয় তা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু কিসে মঙ্গল হয় তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। আপনি দয়া করে দেবতা ও মানুষের মঙ্গলসমূহ ব্যক্ত করুন।

২. অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,

পূজা চ পূজনীযানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : মূর্খ লোকের সেবা না করা, জ্ঞানী লোকের সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল।

৩. পতিরূপদেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,

অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : (ধর্মমত পালনের উপযোগী) প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা উত্তম মঙ্গল।

৪. বহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনযো চ সুসিক্‌খিতো,

সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : বহু শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা উত্তম মঙ্গল।

৫. মাতাপিতু উপটঠান, পুত্তাদারসস সঙ্গহো,

অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : মাতা ও পিতার সেবা করা, স্ত্রী ও পুত্রের উপকার করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঙ্গল।

৬. দানঞ্চ ধম্মচরিযা চ ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,

অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের উপকার করা এবং সদ্ধর্মে অপ্রমত্ত থাকা উত্তম মঙ্গল।

৭. আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,

অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : কায়িক ও মানসিক পাপ কাজে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরতি, মদ্যপানে বিরত থাকা এবং অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উত্তম মঙ্গল।

৮. গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা,

কালেন ধম্মসবণং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।

৯. খন্তী চ সোবচসস্তা, সমণানঞ্চ দসসনং,

কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ পালন করা, শ্রমণদের দর্শন করা, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।

১০. তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ অরিযসচ্চান দস্সনং,

নিব্বানং সচ্ছিকিরিযা চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : তপশ্চর্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করা, চারি আর্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করা এবং পরম নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মঙ্গল।

১১. ফুট্ঠসস লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,

অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : লাভ ও অলাভ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোক না করা, লোভ, দ্বেষ ও মোহের মতো কলুষতা থেকে মুক্ত থাকা এবং নিরাপদ থাকা উত্তম মঙ্গল।

১২. এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা,

সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তিতং তেসং মঙ্গলমুত্তমং।

বাংলা অনুবাদ : এসব মঙ্গলকর্ম সম্পাদন করলে সর্বত্র জয় লাভ করা যায় এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকা যায় - এগুলো তাঁদের (দেব-মনুষ্যের) উত্তম মঙ্গল।

অনুশীলনমূলক কাজ

মঙ্গলসূত্রটি শুদ্ধ উচ্চারণে সমস্বরে আবৃত্তি করো (দলীয় কাজ)

মঙ্গলসূত্রে বর্ণিত মঙ্গলসমূহের তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয়ভাবে)

পাঠ : ৪

মঙ্গলসাধনের উপায়

মঙ্গলসূত্রে বুদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মঙ্গলসাধনের উপায় নির্দেশ করেছেন। সূত্রটি পাঠ করলে দেখা যায়, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশ সাধনে মঙ্গল সূত্রের উপদেশসমূহের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মঙ্গলসূত্রের প্রতিটি উপদেশে মঙ্গলসাধনের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

সূত্রে বলা আছে পণ্ডিত বা জ্ঞানি ব্যক্তির সেবা করতে হবে, মুর্খ লোককে সেবা করা যাবে না। পূজনীয় ব্যক্তির সেবা করলে মঙ্গল সাধিত হয়। সদ্ধর্ম আচরণ করা যায় এমন দেশে বসবাস করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে দেশে সৎভাবে জীবনযাপন করা যায় সে দেশে বসবাস করলে মঙ্গল সাধিত হয়।

নানারূপ শাস্ত্র ও বিদ্যা অর্জন করে সুশিক্ষিত হতে হবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির বড় গুণ বিনয় ও ভদ্রতা। মঙ্গলসূত্রে বিনয়ী হতে ও সুভাষিত বাক্য বলতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ নির্দেশনা মেনে চললে মঙ্গল সাধিত হয়।

মাতা-পিতা সন্তানদের অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেন। মাতা-পিতার কারণেই আমরা পৃথিবীর আলো দেখি। বিবেকসম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই মাতা-পিতার সেবা করা পবিত্র কর্তব্য। স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও কর্তব্য পালন করতে হয়। এতে মঙ্গল সাধিত হয়।

সৎ ব্যবসা ও চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে মঙ্গল সাধিত হয়। দান করা, ধর্মাচরণ করা, আত্মীয়-পরিজনের উপকার করা এবং ধর্ম পালনে অবিচল থাকলে মঙ্গল সাধিত হয়।

কায়িক ও মানসিক পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে। মাদক সেবন না করে অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মঙ্গল সাধিত হয়।

গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌবর করা তাঁদের যথাযথ সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করা, নিজের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করলে মঙ্গল সাধিত হয়।

ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, সকলের ক্ষমাশীল হতে হবে। গুরু বা শিক্ষকের নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে।

শ্রমণদের দর্শন ও যথাসময়ে ধর্মালোচনা করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মঙ্গল সাধিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের পরম লক্ষ্য নির্বাণ। কুশলকর্ম সম্পাদন করে নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে হয়। এজন্যেই মঙ্গল সূত্রে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য পালন ও চতুরার্য্যসত্য উপলব্ধি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে মঙ্গল সাধিত হয়।

ইহ জাগতিক লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচল থাকতে পারলে মঙ্গল সাধিত হয়। শোক, পরিতাপ, লোভ, দ্বেষ, মোহ –এ সবই ক্ষতিকর। এসব থেকে মুক্ত হতে পারলে মঙ্গল সাধিত হয়।

উল্লিখিত সকল কাজই মঙ্গল বা কুশলকর্ম। এ সমস্ত কুশলকর্ম জীবনে অনুশীলন করলে মানুষের মঙ্গল সাধিত হয়। মঙ্গল সূত্রের প্রতিটি নির্দেশনা মানব জীবনে অনুসরণযোগ্য। এই নির্দেশনাসমূহ প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল সাধনের উপায় নির্দেশ করে।

পাঠ : ৫
দণ্ডবর্গের পটভূমি

'দণ্ড' অর্থ শাস্তি। অন্যায় বা অপরাধ করলে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অপরাধ করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু শাস্তি অনেক সময় অপরাধের পরিমাণ না কমিয়ে আরও অপরাধ করার ইচ্ছা জাগায়। আবার ভুল করে নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেলে আরও অন্যায় হয় এবং মনঃকষ্ট বাড়ে। দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করে অন্যকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট ভোগ করতে হয়। জীবন সকলের কাছেই প্রিয়। এজন্যে মৃত্যুদণ্ড প্রদান একটি চরম সিদ্ধান্ত। যিনি দণ্ড প্রদান করেন তিনি বিচারক। তাঁকে জ্ঞানী হতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক কিছু বিবেচনা করে শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করে থাকেন। দণ্ড বিষয়ে ধর্মপদের দশম অধ্যায়ে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বুদ্ধের বর্ণিত এই ধর্মপোদেশ 'দণ্ডবর্গ' নামে অভিহিত। এ বর্গে বুদ্ধ দণ্ডের প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তিনি শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তিভোগকারীর কষ্ট ও মনোবেদনাকে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। শাস্তির জন্য শাস্তি প্রদান নয় বরং চিত্ত শুদ্ধি আনয়ন করতে পারলে অন্যায় অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব। হত্যার বদলে হত্যা, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত কখনো শান্তি আনতে পারে না। তাই কবি বলেছেন,

দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

পাঠ : ৬
দণ্ডবর্গ (পালি ও বাংলা)

দণ্ডবগ্গ (পালি)

১. সব্বে তসন্তি দণ্ডসস সব্বে ভাযন্তি মচ্চুনো,

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।

বাংলা অনুবাদ : সবাই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। নিজের সঙ্গে এসব তুলনা করে কাউকে আঘাত কিংবা হত্যা করো না।

২. সব্বে তসন্তি দণ্ড সস সব্বেসং জীবিতং পিযং

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

বাংলা অনুবাদ : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সবার প্রিয়, সুতরাং নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে প্রহার কিংবা আঘাত করো না।

৩. সুখকামানি ভুতানি যোদণ্ডে বিহিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।

বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যে সুখ প্রত্যাশী প্রাণীগণকে দণ্ড দেয়, পরলোকে সে কখনো সুখ লাভ করতে পারে না।

৪. সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডে ন হিংসতি,

অত্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সে লভতে সুখং।

বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যিনি অপর সুখকামী প্রাণীগণকে দণ্ড দেন না, পরলোকে তিনি নিশ্চয়ই সুখ লাভ করবেন।

৫. মা বোচ ফরুসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয্যু তং,

দুক্‌খ হি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয্যু তং।

বাংলা অনুবাদ : কাউকে কটু কথা বলবে না। যাকে কটু কথা বলবে সেও তোমাকে কটু কথা বলতে পারে। ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখকর, সেজন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকে স্পর্শ করবে।

৬. সচে নেরেসি অত্তানং কংসো উপহতো যথা,

এস পত্তোসি নিব্বাণং সহরম্ভো তে ন বিজ্জতি।

বাংলা অনুবাদ : আঘাত পাওয়া কাঁসার মতো যদি নিজেকে সহনশীল রাখতে পার তবেই তুমি নির্বাণ লাভ করবে, ক্রোধ থেকে জন্ম নেওয়া বাদ- বিসম্বাদ আর থাকবে না।

৭. যথা দণ্ডে গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং

এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ু পাচেন্তি পাণিনং।

বাংলা অনুবাদ : রাখাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়িয়ে গোচারণ ভূমিতে নিয়ে যায়, সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

৮. অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্‌ঝতি,

সেহি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্‌গিদড্‌ঢোব তপ্পতি।

বাংলা অনুবাদ : নির্বোধ লোক পাপ কাজ করার সময় তার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং দুষ্ট লোক নিজের কর্মের দ্বারা আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা ভোগ করে।

৯. যো দণ্ডে অদণ্ডে সু অপ্পদুট্‌ঠেসু দুস্‌সতি,

দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমে নিগচ্ছতি।

বাংলা অনুবাদ : অদণ্ডনীয় (নির্দোষ) ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি দণ্ড প্রদান করে, সে ব্যক্তি সহসা দশবিধ অবস্থার মধ্যে অন্যতর (অবস্থা) লাভ করে।

১০. বেদনং ফরুসং জানিং সরীরসস চ ভেদনং,

গরুকং বাহ্‌পি আবাধং চিত্তকখেপং'বা পাপুণে।

বাংলা অনুবাদ : (তার) তীব্র বেদনা, ক্ষয়ক্ষতি, শরীরের অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি বা চিত্তবিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়।

১১. রাজতো বা উপস্‌সগ্‌গং অবভক্‌খানং’ব দারুণং
পরিকখয়ং’ব ঞাতীনং ভোগানং’ব পভঙ্গুণং।

বাংলা অনুবাদ : (সে) রাজরোষ বা দারুণ অপবাদের সম্মুখীন হয়, (তার) জ্ঞাতিক্ষয় হয় এবং সম্পদ নাশ হয়।

১২. অথ’বাসস অগারানি অগগি ডহতি পাবকো,

কায়স্‌স ভেদা দুপপঞঞো নিরয়ং সোপ্পজ্জতি।

বাংলা অনুবাদ : (তার) ঘর আগুনে পুড়ে যায়, মৃত্যুর পর সে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নরকে উৎপন্ন হয়।

১৩. ন নগ্‌গচরিয়া ন জটা ন পঙ্কা

নানাসকা খন্ডিলসাযিকা বা,

রজোজলন্ডং উক্কটিকপ্পধানং

সোধেন্তি মচ্চং অবিতিণ্নক্‌খং।

বাংলা অনুবাদ : নগ্নচর্যা, জটাধারণ, কাদালেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিতে শয়ন, ধুলি বা ছাইমাখা, কঠিন উৎকট তপস্যায় নিজেকে পীড়ন করা, এসব জপতপ কিছুতেই সংশয়ভরা মানুষকে পবিত্র করতে পারে না।

১৪. অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য

সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,

সব্বেসু ভুতেসু নিধায় দণ্ডং,

সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিকখু।

বাংলা অনুবাদ : অলংকৃত হয়েও যিনি শান্ত, দমিত ও সব সময় ব্রহ্মচারী, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাহীন হয়ে শান্তিময় আচরণ করেন তিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু।

১৫. হিরীনিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি,

যো নিন্দং অপ্পবোধতি অসসো ভদ্রো কসামিব।

বাংলা অনুবাদ : সুশিক্ষিত ঘোড়া যেমন কশাঘাতকে এড়িয়ে চলে, সেইরূপ লজ্জাবোধে নিন্দনীয় কাজ এড়িয়ে চলেন এমন লোক কয়জন আছেন?

১৬. অস্‌সো যথা ভদ্রো কসানিবিঠো

আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ,

সদ্ধায় সীলেন চ বিরিযেন চ

সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছযেন চ;

সম্পন্ন বিজ্‌জাচরণা পতিস্‌সতা

পহসুসথ দুক্‌খমিদং অনপ্পকং।

বাংলা অনুবাদ : বেতের আঘাতে ভদ্র (সুশিক্ষিত) ঘোড়া যেমন বেগবান হয়, সেরূপ তোমরা শক্তিমান ও বেগযুক্ত হও। শ্রদ্ধা, শীল, শৌর্য, সমাধি ও ধর্মজ্ঞান দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে অপরিমেয় দুঃখরাশি হতে মুক্ত হও।

১৭. উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা

উসুকারা নমযন্তি তেজনং,

দারুং নমযন্তি তচ্ছকা

অত্তানং দমযন্তি সুব্বতা।

বাংলা অনুবাদ : জল সেচনকারী যেমন জলকে ইচ্ছামতো চালিত করেন, শর-নির্মাতা যেমন শরকে সোজা করেন, কাঠমিস্ত্রি (তক্ষক) যেমন কাঠের টুকরাকে ইচ্ছামতো আকার দান করেন, ব্রতচারী ব্যক্তিও তেমনি নিজেকে দমন করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
বিতর্ক অনুষ্ঠান
বিষয় : হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়

পাঠ : ৭
দণ্ডের পরিণাম

জীবন সকলেরই প্রিয়। জগতের সকল প্রাণী মৃত্যু এবং দণ্ডকে ভয় পায়। তাই অপরকে নিজের মতো ভেবে কাউকে আঘাত করা উচিত নয়। কিন্তু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য দুর্মতি-পরায়ণ ব্যক্তি অপরকে দণ্ড দ্বারা আঘাত এবং হত্যা করে। কিন্তু দণ্ড প্রয়োগে প্রকৃত সুখ অর্জন করা যায় না। দণ্ডের পরিণাম ভয়াবহ। এতে প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়, শত্রুতা বাড়ে। নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ গুরুতর অপরাধ এবং পাপও বটে। যে দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি নিরপরাধ ব্যক্তি, কল্যাণ মিত্র বা সাধু ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ করে বা মিথ্যা নিন্দা আরোপ করে, পরিণাম স্বরূপ সে দশবিধ দুঃখজনক অবস্থার অন্যতম অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। যথা : ১) সে শিরঃপীড়া, শূলরোগ প্রভৃতি দ্বারা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে; ২) তার স্বীয় শ্রমলব্ধ সম্পত্তির অপচয় হয়; ৩) তার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়; ৪) তার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চক্ষুহানি, মেরুদণ্ড বিকৃতি, কুষ্ঠ প্রভৃতি গুরুতর রোগ উৎপন্ন হয়; ৫) সে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়; ৬) তাকে রাজাপরাধী সাব্যস্ত করে রাজকর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হয়; ৭) সে অনাকাঙ্খিত বিষয়ে জড়িত হয়ে নিদারুণ কলঙ্কের ভাগী হয়; ৮) তার আশ্রয়দাতা জ্ঞাতিগণের বিয়োগ হয়; ৯) তার সঞ্চিত ধন-সম্পদ নষ্ট হয় এবং ১০) তার গৃহ আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়।

এই ভয়াবহ পরিণাম হতে রক্ষা পেতে হলে দণ্ড ত্যাগ করে মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত। বুদ্ধ বলেছেন, শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয় না। মৈত্রী বা ভালোবাসা দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয়। যিনি নিজের সুখের জন্য অপর সুখকাতর জীবের প্রতি হিংসা করেন না, দণ্ড প্রয়োগ করেন না, তিনি মৃত্যুর পর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে পরিশেষে পরম নির্বাণসুখ লাভ করেন। তাই সকলের দণ্ড ত্যাগ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ
দণ্ডের পরিণাম বর্ণনা কর

পাঠ : ৮

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষা

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। মঙ্গলসূত্রে মানুষকে জ্ঞানী লোকের সেবা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানী লোককে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনা মানতে হবে। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের উপযোগী দেশে বসবাস করতে বলা হয়েছে। ভালো কাজের কথা স্মরণ করে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নানা বিষয়ে বিদ্যা অর্জন, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সব সময় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে যাতে কেউ কষ্ট না পায়। মাতা-পিতা গুরুজনের সেবা করতে হবে। স্ত্রী-পুত্রের উপকার করতে হবে। সৎ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। দান-ধর্ম প্রদান ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করতে হবে। সদ্ধর্মে অবিচল থাকতে হবে। শারীরিক বা মানসিক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে। কীর্তিমান সফল ব্যক্তিদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার করতে হবে। যথাসময়ে ধর্ম কথা শুনতে হবে। ক্ষমাপরায়ণ হতে হবে। ধৈর্য ও প্রতিপদ বাক্য চর্চা করতে হবে। ভিক্ষু-শ্রমণ দর্শন ও ধর্ম আলোচনা করতে হবে। ধ্যান, সমাধি ও চারি আর্যসত্য অনুধাবন করতে হবে। নির্বাণ পথে পরিচালিত হতে হবে। লাভ-ক্ষতি, খ্যাতি-অখ্যাতি, নিন্দা বা প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সর্ব ক্ষেত্রেই চিত্তকে স্থির রাখা, শোক না করা, লোভ, হিংসা, মোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকার অনুশীলন করে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা এ সকল মেনে জীবন যাপন করে তাঁরা সব সময় সর্বক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারে। মঙ্গলসূত্রে বুদ্ধ এ সমস্ত কাজকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলেছেন। মঙ্গলসূত্রে ওপরে বর্ণিত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারি।

দণ্ডবর্গ পাঠেও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করা যায়। দণ্ডবর্গ হতে আমরা শিক্ষা পাই যে দণ্ড প্রয়োগ বা শাস্তি দ্বারা অন্যায় প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। অন্যায়কারীকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারলেই অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব। কারো প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তির পরিণাম বিবেচনা করতে হয়। অপরকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হওয়া যায় না। প্রচলিত আইনে অপরাধীর জন্য যে শাস্তির বিধান আছে তা প্রয়োগে কর্তৃপক্ষকে হতে হবে খুবই সতর্ক। কারণ, বলা আছে ভুল বিচারে একাধিক দোষী ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যাক, কিন্তু একজনও নিরপরাধ ব্যক্তি যেন বিনা দোষে শাস্তি না পায়। দণ্ডবর্গে প্রতিহিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারো প্রতি কটুকথা, ক্রোধপূর্ণ বাক্য বা প্রতিদণ্ড প্রদান করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিলে ইহজগতে এবং পরজন্মে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। মৈত্রী অনুশীলনের মাধ্যমে শত্রুকেও বন্ধু করা সম্ভব। কারও প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিহিংসাবশত দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। আত্মসংযম, সহনশীলতা, মৈত্রী ও ক্ষমাশীলতা অনুশীলন করা উচিত।

জীবন সকলের প্রিয়। সবাই মৃত্যু এবং দণ্ডকে ভয় পায়। তাই অন্যের জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে শাস্তি প্রদানের পরিণাম অনুধাবন করতে দণ্ডবর্গ শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পৃথক তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. দণ্ড বিষয়ে ধর্মপদের .... চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়।

২. বুদ্ধবর্ণিত মঙ্গলসমূহ অনুসরণ করলে সবখানে .... করা যায়।

৩. শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তির ------ বিবেচনা করতে হয়।

৪. মা-বাবা গুরুজনে .... করতে হয়।

৫. মৈত্রী বা ভালোবাসা দ্বারা .... বন্ধু করা সম্ভব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ত্রিপিটকের কোথায় নীতিগাথাসমূহ সংরক্ষিত আছে?

২. 'ধর্মপদ' নামকরণ কেন হলো?

৩. ধর্মপদের কোন অধ্যায়ে 'দণ্ডবর্গ' পাওয়া যায়?

৪. মাতাপিতু উপট্ঠান, পুত্তাদারসস সঙ্গহো, অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গল মুত্তমং– বাংলায় লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধ কেন মঙ্গল সূত্র দেশনা করেছিলেন?

২. কাদের সেবা করলে উত্তম মঙ্গল হয়?

৩. "নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি পাওয়া উচিত নয়" ব্যাখ্যা কর।

৪. মঙ্গলসূত্র হতে কী শিক্ষা লাভ করা যায় তা বর্ণনা কর।

৫. দণ্ডের পরিণাম বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মঙ্গলসূত্রে' কয় প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে?

ক. ২৬ খ. ৩০

গ. ৩২ ঘ. ৩৮

২. 'মাতাপিতু উপট্ঠান' বলতে বোঝায় -

ক. মা-বাবাকে সম্মান করা খ. মা-বাবার সেবা করা

গ. মা-বাবার গৌরব করা ঘ. জ্ঞানী লোকের সেবা করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অরিন্দম সিংহ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। স্কুলে গিয়ে সে জানতে পারে তার ধর্মীয় শিক্ষক কয়েক দিন যাবৎ অসুস্থ। সে শিক্ষকের সেবা করতে তাঁর বাড়ি গেল।

৩. অরিন্দম সিংহের আচরণে মঙ্গলসূত্রের যে উপদেশটি প্রতিফলিত হচ্ছে তা হলো-

i. জ্ঞানী লোকের সেবা করা

ii. পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা

iii. শ্রমণদের দর্শন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. অরিন্দমের কাজকে কোন ধরনের কাজ বলা যায়?

ক. মঙ্গলের খ. উত্তম মঙ্গলের

গ. গৌরবের ঘ. সম্মানের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা-১

গৃধ্র জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃধ্র বা শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বুড়ো মা-বাবাকে দেখাশোনা করতেন। তাঁরা এক পর্বতের ওপর শকুনদের নির্জন গুহায় থাকতেন। বোধিসত্ত্ব বারানসীর শ্মশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা-বাবাকে খাওয়াতেন।.

ঘটনা-২

মিলির মা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দেখলেন, পাশের বাড়ির খুকি খালি কলস নিয়ে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে। এতে মিলির মা তাকে গালমন্দ করে।

ক. বুদ্ধের দেশিত সূত্রসমূহ কোথায় সংরক্ষিত আছে?

খ. বিচারককে জ্ঞানী হতে হয় কেন?

গ. ঘটনা-১ -এর সাথে মঙ্গলসূত্রের কোন শ্লোকের মিল পাওয়া যায়, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিলির মায়ের আচরণটি মঙ্গলসূত্রের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. **অনুচ্ছেদ-১**

রাজু মুৎসুদ্দির চাকুরি ক্ষেত্রে অনেক সুনাম রয়েছে। কিন্তু তাঁর অনেক সহকর্মী অফিসের দায়িত্ব পালনের সময় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম করত। একদিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অফিসে অডিট করতে এসে বিভিন্ন অপকর্মের সন্ধান পান। সহকর্মীরা উক্ত অপকর্মের জন্য উল্টো রাজুকেই দোষারোপ করেন। যার ফলে তাঁকে বিভাগীয় শাস্তি ভোগ করতে হয়।

অনুচ্ছেদ-২

হে প্রিয় তুমি যদি কারো প্রতি ক্ষুব্ধ হও,

কেউ যদি তোমাকে রুষ্ট করে,

মৈত্রী ও শান্তির বাণী উচ্চারণ কর

সহসা তোমার রাগ থেমে যাবে।

ক. 'খুদ্দক পাঠ' শব্দের অর্থ কী?

খ. দেবতারা বুদ্ধের কাছে কেন গিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদ-১ -এর সাথে দণ্ডবর্গের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদ-২ -এর সাথে দণ্ডবর্গের সাদৃশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুরার্য সত্য

একদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। তারপর ছয় বছর তপস্যার ফলে লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আবিষ্কার করেন দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য। একে বৌদ্ধ পরিভাষায় চতুরার্য সত্য বলা হয়। চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব। বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম চতুরার্য সত্য দেশনা করেন। চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। এ সত্যকে ভালোভাবে বুঝতে পারলে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ সম্ভব। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি চতুরার্য সত্য সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* চতুরার্য সত্যের ধারণা দিতে পারব।
* দুঃখসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
* দুঃখের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
* দুঃখ হতে মুক্তির উপায় বর্ণনা করতে পারব।
* চতুরার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

চতুরার্য সত্য পরিচিতি

চতুরার্য সত্য বুদ্ধের অনন্য উপলব্ধি। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়ে নানা অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। তরুণ বয়সে সিদ্ধার্থ নগর দর্শনে বের হলে ব্যাধি এবং জরাগ্রস্ত মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে দেখেন। একদল লোককে শোক করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখেন। জীবনের এরূপ পরিণতি দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন জগৎ দুঃখময়। তারপর, সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগী একজন সন্ন্যাসীকে দেখেন। সাথে থাকা সারথী ছন্দককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ শান্ত-সৌম্য ব্যক্তিটি কে'? ছন্দক বললেন, ইনি শান্তি অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করেছেন। সিদ্ধার্থও দুঃখমুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে দুঃখমুক্তির উপায় চতুরার্য সত্য আবিষ্কার করেন। চতুরার্য সত্যসমূহ হচ্ছে :

১। দুঃখ আর্যসত্য

২। দুঃখের কারণ আর্যসত্য

৩। দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

৪। দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

চতুরার্য সত্যসমূহ কী কী?

পাঠ : ২
চতুরার্য সত্যের ব্যাখ্যা

দুঃখ আর্যসত্য

জগৎ দুঃখময়। সুখ এখানে ক্ষণস্থায়ী। যা কিছু আমরা সুখ বলে জানি তা সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এই ছুটে চলার মাঝে দুঃখই পাই বেশি। সুখ যেন পরশ পাথর, বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যায়। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না সুখের আড়ালেই দুঃখ রয়েছে। জ্ঞানের অভাবে আমরা দুঃখকে চিনতে পারি না। অজ্ঞতাই দুঃখকে চিনতে না পারার কারণ। সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে মানুষ দুঃখ ভোগ করে। দুঃখ অনেক প্রকার। বুদ্ধ সেগুলোকে প্রধানত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১) জন্ম দুঃখ
২) জরা দুঃখ
৩) ব্যাধি দুঃখ
৪) মৃত্যু দুঃখ
৫) অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ
৬) প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ
৭) ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং
৮) পঞ্চস্কন্ধময় এ দেহ ও মন দুঃখময়।

এ দুঃখগুলো চরম সত্য। দুঃখ সর্বজনীন। সকলকে কোনো না কোনোভাবে দুঃখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ হতে কারো নিস্তার নেই। তাই বুদ্ধ এগুলোকে দুঃখ আর্যসত্য বলে অভিহিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন নানা দুঃখে পূর্ণ। জীবিত মানুষ মাত্রেই নানা রকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বয়স বাড়ে, দাঁত পড়ে, দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে। চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়। একে বলে জরাগ্রস্ত হওয়া। বার্ধক্য আঘাত হানে। চুল পাকে। এমনি করে একদিন মৃত্যু আসে। একজনের মৃত্যু হলে প্রিয়জন শোক করে। এভাবে দুঃখের সমুদ্রে মানুষের জীবন ভাসমান।

অনুশীলনমূলক কাজ

দুঃখ আর্যসত্যে বর্ণিত দুঃখসমূহ উল্লেখ কর (দলীয় কাজ)

দুঃখের কারণ আর্যসত্য

কারণ ছাড়া কোনো কার্যের উৎপত্তি হয় না। সবকিছুরই কারণ আছে। দুঃখ উৎপত্তিরও কারণ আছে। দুঃখ আছে জেনেও মানুষ মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে আরও দুঃখ ভোগ করে। জন্ম নিলেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাহলে কী কারণে মানুষ জন্মগ্রহণ করে? জন্মের কারণ তৃষ্ণা। আর তৃষ্ণার কারণ অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অভাব। অজ্ঞতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য মনে করি। ফলে পৃথিবীর রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হই এবং তা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আগুনের কাছে যায় এবং আহত বা হতও হয়, তেমনি মানুষও মোহাচ্ছন্ন হয়ে বারবার দুঃখ ভোগ করে। জগতের ক্ষণস্থায়ী বস্তু পাওয়ার জন্য তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। এই আকাঙ্ক্ষার ফলেই আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি। কামনা, বাসনা, লোভ, অহংকার, মোহ, শোক- এ সবই তৃষ্ণা থেকে উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

দুঃখের কারণ কী?

দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

আমরা জেনেছি তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার ফলেই আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি। জন্মগ্রহণ করে অসংখ্য দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং তৃষ্ণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। তৃষ্ণার ক্ষয় পুনর্জন্ম রোধ করে। তৃষ্ণার বিনাশ করাই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঔষধ খেতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। সব সমস্যার সমাধান আছে। তথাগত বুদ্ধ কঠোর তপস্যা করে দুঃখ নিরোধের উপায়ও আবিষ্কার করেছেন, যা দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য নামে পরিচিত। বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়। মার্গ অর্থ পথ। আটটি সত্য পথ অনুসরণ করে আমরা দুঃখ নিরোধ করতে পারি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নরূপ :

১. সম্যক দৃষ্টি
২. সম্যক সংকল্প
৩. সম্যক বাক্য
৪. সম্যক কর্ম
৫. সম্যক জীবিকা
৬. সম্যক ব্যায়াম
৭. সম্যক স্মৃতি
৮. সম্যক সমাধি।

অনুশীলনমূলক কাজ
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী?

পাঠ : ৩
চতুরার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব

চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। এই সত্যসমূহ বুঝতে না পারলে বৌদ্ধধর্মকে কখনো বোঝা যাবে না। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য দুঃখ হতে মুক্তি এবং পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করা। দুঃখসমূহ কী কী, কী কারণে দুঃখ উৎপন্ন হয়, দুঃখের নিরোধ আছে কি না এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সঠিকভাবে না জানলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই চতুরার্য সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। চতুরার্য সত্যের মাধ্যমে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। চতুরার্য সত্য মতে, তৃষ্ণাই মানুষের দুঃখের কারণ। অজ্ঞতার কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চতুরার্য সত্য আমাদেরকে লোভ, হিংসা, মোহ ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকার এবং দুঃখ হতে মুক্তির উপায় শিক্ষা দেয়। ফলে, চতুরার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব যে অপরিসীম তা সহজে বোঝা যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ
কেন চতুরার্য সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. সিদ্ধার্থ জগতের .... উপায় অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন।

২. .... বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্ব।

৩. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনই .... পূর্ণ।

৪. .... দুঃখের কারণ।

৫. বুদ্ধ নির্দেশিত ------ দুঃখ নিরোধের উপায়।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সুখের আকাঙ্ক্ষা	দুঃখ ভোগ করতে হয়
২. অজ্ঞতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য	আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়
৩. সকলকে কোনো না কোনোভাবে	দুঃখ নিরোধের উপায়
৪. তৃষ্ণা হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার	সত্যকে অসত্য মনে করি
৫. বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই	তীব্র আকাঙ্ক্ষা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের নামগুলো লেখ।

২. বুদ্ধ দুঃখকে কয় ভাগে বিভক্ত করেন? সেগুলো কী কী, আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চতুরার্য সত্যসমূহ বর্ণনা কর।

২. দুঃখের কারণ আর্যসত্য ব্যাখ্যা কর।

৩. দুঃখ নিবারণের উপায় বর্ণনা কর।

৪. 'চতুরার্য সত্যই বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি' ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কয় প্রকার?

ক. ৪ খ. ৮

গ. ১০ ঘ. ১২

২. চতুরার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব-

i. দুঃখ হতে মুক্তি

ii. নির্বাণ লাভ করা

iii. মার্গফল লাভ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

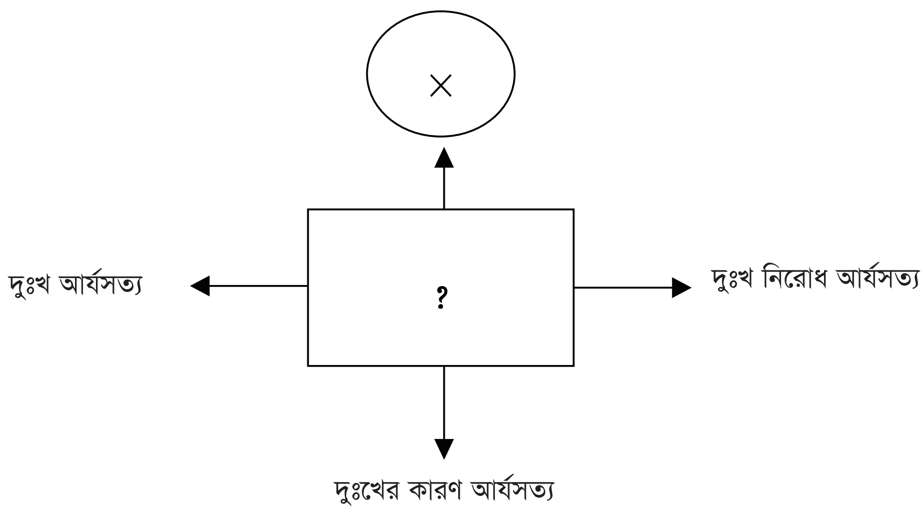

৩. '?' চিহ্নের মাধ্যমে ছকে কী নির্দেশ করছে?

ক. ত্রিপিটক খ. চতুরার্য সত্য

গ. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ঘ. তৃষ্ণার ক্ষয়

৪. ছকে 'X' চিহ্নিত স্থানের সত্যটির লক্ষ্য হলো-

ক. নির্বাণ সাক্ষাৎ করা খ. হিংসার বিনাশ করা

গ. বারবার জন্মগ্রহণ করা ঘ. কামনা-বাসনা পূরণ করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুষমা একজন রাখাইন মেয়ে। তিনি ও তাঁর বন্ধু একদিন কিয়াং (বিহার) -এ প্রার্থনা করতে গিয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন আরেকজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভন্তে, উনি কী করছেন? ভিক্ষু বললেন তিনি ধ্যান-সাধনায় মগ্ন আছেন।

ক. চতুরার্য সত্য কী?

খ. দুঃখের কারণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. বৌদ্ধ ভিক্ষুটি কোন পথ অনুসরণ করছেন? বর্ণনা দাও।

ঘ. উক্ত পথ অনুসরণের ফলে ভিক্ষুটি কোন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা দাও।

২. **ঘটনা-১**

লাভলী ও সৈকত দম্পতির এক সন্তান। তাঁদের স্বপ্ন সন্তানকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করা। কিন্তু সঙ্গদোষে তাদের সন্তান উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়।

ঘটনা-২

ছোটবেলা থেকে সীমান্ত বড়ুয়া দেখছে তার মা প্রায়ই শারীরিক অসুস্থ থাকেন। রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি নিজ সন্তানদের সহ্য করতে পারেন না। একদিন ঐ রোগের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মায়ের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে দুঃখ থেকে মুক্তির আশায় সীমান্ত প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হলেন।

ক. সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছেন কেন?

খ. দুঃখ আর্যসত্য কী?

গ. ঘটনা-১ -এ দুঃখ আর্যসত্যের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ -এ সীমান্তের অনুসৃত পথ থেকে কোন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে বলে মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

বৌদ্ধরা নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন বুদ্ধ-পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি। বৌদ্ধ বিহার এবং পারিবারিক অঙ্গনে এসব আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মীয় বিধি-বিধান মতে আচরণীয় ও পালনীয় অনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলে। কিছু কিছু বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় ভাবধারায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। সেই আচার-অনুষ্ঠানগুলো ধর্মীয় উৎসব নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বছরের বিভিন্ন সময়ে এরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এ অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। এ অধ্যায়ে বৌদ্ধদের কয়েকটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* বৌদ্ধ ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের বর্ণনা দিতে পারব।
* বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পরিচিতি

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ ধর্মীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই অনুষ্ঠিত হয়। যে অনুষ্ঠানগুলো চান্দ্রবছরের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো ধর্মীয় তিথি বা পর্ব। যেমন- বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা ইত্যাদি। এছাড়া যে অনুষ্ঠানগুলো বছরের যেকোনো সময় করা যায় সেগুলোকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়। যেমন– সঙ্ঘদান, অষ্টপরিষ্কারদান, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আবার ‘কঠিন চীবর দান’ অনুষ্ঠান করতে হয় বছরের নির্দিষ্ট মাসে। এটিও একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানগুলো পালনের ব্যাপকতায় উৎসবে পরিণত হয়। বর্তমানকালে প্রায় সব অনুষ্ঠানই উৎসবের আকার ধারণ করে।

বৌদ্ধদের বেশির ভাগ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। তবে অমাবস্যায় কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজনে বাধা নেই। বৌদ্ধধর্ম মতে প্রত্যেক দিনই শুভ। অশুভ বলে কোনো দিন নেই। নিজের কর্মের মধ্যেই শুভ-অশুভ নির্ভর করে। এমন কোনো সময় নেই, যে সময় ভালো কাজ করলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা অত্যন্ত ভালো কাজ। যেকোনো দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা যায়। তবে কিছু আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনেই সম্পাদন করতে হয়। পবিত্র মন নিয়ে এসব দিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা সকলের উচিত। এতে মনের প্রসন্নতা বাড়ে। চিত্ত শুদ্ধ হয়। সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নৈতিকতা জাগ্রত হয় এবং জীবন সুখের হয়।

বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো প্রধানত পূর্ণিমা কেন্দ্রিক। প্রত্যেক পূর্ণিমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোনো না কোনো স্মরণীয় ঘটনা জড়িত রয়েছে। বুদ্ধের জীবনাদর্শে স্মরণ ও অনুশীলনের জন্য বিবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। মূলত, এসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনাগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যুগ যুগ ধরে এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধরা পালন করে আসছে। প্রত্যেক পূর্ণিমায় বৌদ্ধ নর-নারী সকলে বিহারে সমবেত হয়। সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ-পূজা ও উপাসনা করে। পঞ্চশীল ও উপোসথশীল গ্রহণ করে। দুপুরে ধ্যান সমাধি চর্চা করে। বিকালে ভিক্ষুদের কাছ থেকে ধর্মকথা শোনে। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা ও পানীয় পূজা

করে। অনেক বৌদ্ধ বিহারে বিকালে ধর্মসভা ও সন্ধ্যায় বুদ্ধকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। রাতে নির্মল আনন্দচিত্তে সকলে বাড়ি ফিরে যায়।

এই ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধরা একত্র হয়। তাই এসব অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলো একরকম সামাজিক মিলনমেলা। এগুলো ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পালন করতে হয়। এ অনুষ্ঠানসমূহে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা হয়।

বৌদ্ধদের কিছু অনুষ্ঠান আছে পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেগুলোকে পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বলা যায়। যেমন- শ্রমণের প্রব্রজ্যা, মৃতদেহ সৎকার, সূত্র বা পরিত্রাণ পাঠ প্রভৃতি। এসব অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও এলাকার লোকজন সমবেত হয়। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। তাই এ অনুষ্ঠানগুলোরও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধ ধর্মীয় কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের নাম লেখ

পাঠ : ২
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন। সম্মিলিতভাবেই এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। ফলে এসব অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল অনেক। যেমন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ধর্মকথা শ্রবণ করে অস্থির মন শান্ত, প্রসন্ন ও উদার হয়। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। কঠিন ধর্মবাণী বুঝতে সহজ হয়। পুণ্য অর্জিত হয়। দান চিত্ত উদয় হয়। নৈতিক চরিত্র গঠন হয়। দয়াপরায়ণ ও পরোপকার করতে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

এখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনী তুলে ধরব। থেরী উত্তমা পূর্বজন্মে এক ধনশালীর গৃহপরিচারিকা ছিলেন। সেই ধনশালী প্রভু সব সময় নানা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। একদিন উত্তমাও অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে প্রভুর ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় শ্রদ্ধাচিত্তে অনুষ্ঠানের সকল কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি মনে মনে কামনা করেন ভবিষ্যতে তিনিও যেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন দাতা হতে পারেন। এই সুকৃতি ও শুভ কামনার ফলে গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবস্তী নগরের এক ধনীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর দান করতেন এবং মহান দাতা হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই সকলের একাগ্রচিত্তে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা উচিত।

বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর একটি এলাকার অধিবাসীরা একটি সর্বজনীন ধর্মোৎসব আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহা উৎসাহে সকলে কাজে লেগে গেল। চতুর্দিকে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হলো। তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের নিমন্ত্রণ জানানো হলো। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল অন্ন-পানীয় দিয়ে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করা। যথাসময়ে সকল আয়োজন সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠানের দিন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ অনুষ্ঠান মণ্ডপে উপস্থিত হলেন। সকলে মিলে তাঁদের অন্ন-পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করল। নিজেরাও দুপুরের খাবার খেল। তারপর শুরু হলো ধর্মালোচনা সভা। এসময় আয়োজকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গেল। কেউবা গল্পগুজব আরম্ভ করল। কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ল। কিছু লোক অন্যমনস্ক ছিল। শ্রদ্ধাচিত্তে ধর্মালোচনায় মনোনিবেশ করল

মাত্র কয়েকজন। বুদ্ধশিষ্যরা বিষয়টি লক্ষ করলেন। তাঁরা তথাগত বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত বড় ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করে এলাকাবাসী নিজেরা কেন ধর্ম শ্রবণে অপারগ হলো উত্তরে বুদ্ধ বললেন, "ধর্মাচরণের আনন্দ সকলে লাভ করতে পারে না। ধর্মের রসবোধ উপলব্ধিতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। গভীর সমুদ্র যেমন সকলে পাড়ি দিতে পারে না, তেমনি ধর্মপথ পাড়ি দিতে পারে অল্প কয়জন ব্যক্তি মাত্র। যাঁরা একাগ্রচিত্ত ও সচেতন তাঁরাই পারে জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি অর্জন করতে।" তাই সর্বদা শ্রদ্ধাচিত্তে একাগ্রতার সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত।

বৌদ্ধ ধর্মীয় পূর্ণিমা অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী পাঠে এ পূর্ণিমাগুলোর বিবরণ দেওয়া হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের কয়েকটি সুফল বল

পাঠ : ৩

বুদ্ধ পূর্ণিমা

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিই বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে খ্যাত। এ দিনে সিদ্ধার্থ গৌতম হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শাক্যরাজ্যে রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি একই তিথিতে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আশি বছর বয়সে একই পূর্ণিমা তিথিতেই কুশীনগরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাষায় এটিকে মহাপরিনির্বাণ বলে। গৌতম বুদ্ধের মহাজীবনের এই তিনটি মহান ঘটনা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই বৈশাখী পূর্ণিমাকে বুদ্ধ পূর্ণিমাও বলা হয়। বৌদ্ধদের কাছে এ পূর্ণিমার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমকের সাথে বৌদ্ধরা বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করে থাকে।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় পূজার উপকরণ নিয়ে উপাসক-উপাসিকা বিহারে যাচ্ছেন

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূত্র পাঠ ও বুদ্ধকীর্তনের মাধ্যমে প্রভাতফেরি করে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবের সূচনা হয়। আগের দিন বৌদ্ধ বিহারগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নানা রকম ফুল, পাতা ও রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। এভাবে অনুষ্ঠানে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। পূর্ণিমার দিন সকালে বুদ্ধ পূজা, সমবেত উপাসনা, পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ প্রভৃতি করা হয়। দুপুর বারটার আগে ভিক্ষুসংঘকে দুপুরের আহার দান করা হয়, যা পিণ্ডদান নামে পরিচিত। দায়ক-দায়িকরাও দুপুরের আহার সম্পন্ন করে বৌদ্ধ বিহারে ধ্যান সমাধি করেন। বিকালে ধর্মসভা হয়। এতে গৌতম বুদ্ধের জীবন, ধর্ম, দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধকীর্তন হয়। আজকাল অনেক বৌদ্ধ বিহারে এ উপলক্ষে রক্তদানের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে মরণোত্তর চোখ দান করার প্রতিশ্রুতি দেন, যা অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। সন্ধ্যায় অনেক বৌদ্ধ বিহারে ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে ধর্মালোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করে। এতে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব সৃষ্টি হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত বুদ্ধের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এ ঘটনাগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘটেছিল। যেমন, জন্ম হয়েছিল লুম্বিনী কাননে। এটি বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত। গাছ-পালা তরুলতায় ভরা ছিল লুম্বিনী কানন। বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছিল গয়ার উন্মুক্ত বোধিবৃক্ষমূলে। এটি বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়া জেলায় অবস্থিত।

মহাপরিনির্বাণ হয়েছিল হিরণ্যবতী নদীর তীরস্থ কুশিনগরের জোড়া শালবৃক্ষের মূলে। তাই প্রকৃতির প্রতিও মৈত্রী প্রদর্শন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছেঁড়া ও ডালপালা কাটা উচিত নয়। বিদ্যালয় ও বাড়ির আঙিনার আশে-পাশে গাছের পরিচর্যা করা সকলের উচিত। প্রকৃতির সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্ক ও অবিচ্ছেদ্য। আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসটি 'বৈশাখ ডে' নামে উদযাপিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

তোমার এলাকার বৌদ্ধ বিহারের বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের একটি দিনব্যাপী কর্মসূচি তৈরি কর (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৪

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিই আষাঢ়ী পূর্ণিমা নামে খ্যাত। গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। এগুলো হলো মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং প্রথম ধর্ম প্রচার।

কথিত আছে যে, এ শুভ পূর্ণিমা তিথির রাতে শাক্য রাজ্যের রানি মায়াদেবী একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, দেবতারা তাঁকে একটি মনোরম পালঙ্ক করে অনোবতপ্ত হ্রদের তীরে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরই একটি সাদা হাতি ডানদিক দিয়ে তাঁর শরীরে একটি শ্বেতপদ্ম প্রবেশ করিয়ে দেয়। পরদিন রানি রাজা শুদ্ধোদনকে তাঁর সুন্দর স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। রাজা শুদ্ধোদন জ্যোতিষীদের ডেকে স্বপ্নের কারণ জানতে চান। জ্যোতিষীরা বলেন, মহারাজ শীঘ্রই পুত্রসন্তান লাভ করতে যাচ্ছেন এবং এ ভাবী পুত্রসন্তানই হবেন মহাজ্ঞানী বুদ্ধ। এ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন।

এমনই এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংসারের সকল ভোগ বিলাস ত্যাগ করে দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণে তিনি গৃহত্যাগ করেন। এ সময় সিদ্ধার্থ গৌতমের বয়স হয়েছিল উনত্রিশ বছর। রাজত্ব ও স্ত্রী পুত্রের মায়া ত্যাগ করে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন। এ ঘটনাটি 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' নামে বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিচিত। মহাভিনিষ্ক্রমণ বলতে বুদ্ধের গৃহত্যাগকে বোঝায়।

বুদ্ধত্ব লাভের পর আরো এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা হলেন : কোণ্ডঞ্ঞ, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিত। বুদ্ধের প্রচারিত প্রথম ধর্মবাণীকে বলা হয় 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র'। জীবজগতের কল্যাণে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে এই সূত্র দেশনা করেছিলেন। বুদ্ধের মহৎ জীবনের স্মৃতি বিজড়িত এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ স্মরণীয় ও বরণীয় তিথি।

এ পূর্ণিমার সাথে আরো কিছু ধর্মীয় বিষয় সংযুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসব্রত পালনের নির্দেশ দেন। তখন থেকে ভিক্ষুরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস বর্ষাব্রত পালন করে থাকেন। এ সময় তাঁরা ধর্ম-বিনয় অধ্যয়ন এবং ধ্যান চর্চায় রত থাকেন। সে সময় জরুরি কারণ ছাড়া কোনো ভিক্ষু নিজ বিহারের বাহিরে রাত্রিযাপন করতে পারেন না। এটি ভিক্ষুদের বিনয় বিধান। ২) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ পরলোকগত মাতা মায়াদেবীকে ধর্ম দেশনার জন্য তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। সেখানে তিনি তিন মাস অবস্থান করেন এবং মাতা মায়াদেবী ও দেবতাদের নিকট অভিধর্ম দেশনা করেন। ৩) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই তিনি যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন।

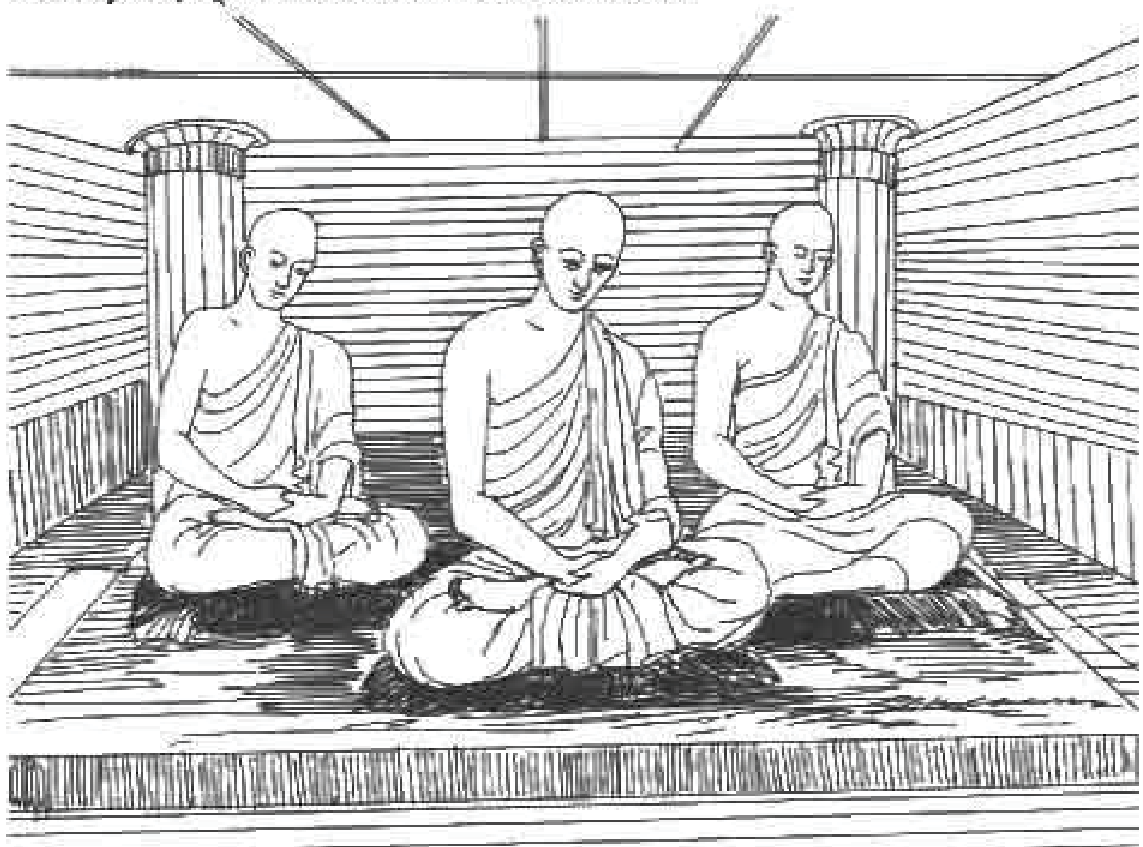

ভিক্ষুরা বিহারে বসে ধ্যানচর্চা করছেন

বুদ্ধ পূর্ণিমার মতো, এ পূর্ণিমা তিথিতেও উপাসক-উপাসিকাগণ বিহারে সমবেত হন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে তাঁরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করেন। যাঁরা অষ্টশীল গ্রহণ করেন তাঁরা ঐ দিন উপোসথ পালন করেন। এ সময় ভিক্ষুরা উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা করেন। এতে গৃহীদের মধ্যে ধর্মভাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া একসাথে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্ম চর্চা করার কারণে নিজেদের মধ্যেই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

ভোর থেকেই আষাঢ়ী পূর্ণিমার উৎসব শুরু হয়। দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে ওঠে বৌদ্ধ বিহার। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধ কীর্তন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় সমগ্র কর্মসূচি। অনেকে এ তিথিকে উপলক্ষ করে নিজ বাড়িতে বসে রাত পর্যন্ত বিদর্শন ভাবনা করেন। আবার অনেকে তিনদিন বা এক সপ্তাহের জন্য ধ্যান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ
বুদ্ধের জীবনের কোন তিনটি ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছিল?

পাঠ : ৫
মধু পূর্ণিমা

দান, সেবা ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল মধু পূর্ণিমা তিথি। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিকেই বলা হয় মধু পূর্ণিমা। এরূপ নামকরণের ক্ষেত্রে দানের একটি কাহিনী রয়েছে, যা বৌদ্ধ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

একসময় বুদ্ধ কৌশাম্বিতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় সম্পর্কীয় একটি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয়। ক্রমে কলহের প্রভাব কৌশাম্বির সকল আবাসিক ভিক্ষুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ভিক্ষুরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একসময় বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বুদ্ধ সকল ভিক্ষুদের আহ্বান করে কলহ-বিবাদ করা অনুচিত বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন। রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়ে অনড় থাকা উচিত নয় বলে তিনি সকলকে জানান। এ উপদেশ প্রদানকালে বুদ্ধ তাদের দীর্ঘায়ু কুমারের কাহিনী বলেন। সে কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, কলহ ও রাগের প্রভাব জন্ম ও জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এতে উভয়ের ক্ষতি ছাড়া কোনো মঙ্গল হয় না। এমনকি শুধু কলহজনিত রাগের কারণে কোনো ভালো কাজও উপযুক্ত সময়ে করা যায় না। তাই সবসময় কলহ-বিবাদ পরিত্যাগ করা উচিত। বুদ্ধের নানাবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুরা কলহ থেকে বিরত হলেন না। নিজেদের মধ্যে কলহ ত্যাগ করে প্রীতির সম্পর্কে তৈরি করতে পারলেন না।

তখন বুদ্ধ কৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুদের সংসর্গ ত্যাগ করে নিজে একাকী নির্জন গহীন বনে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। একসময় তিনি চলে গেলেন পারিলেয়্য নামক বনে। ভিক্ষুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে তিনি সেখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে লাগলেন। বুদ্ধ বনের মধ্যে একটি ভদ্রশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান করছিল একটি হাতি। হাতিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের শুঁড় দিয়ে বুদ্ধের বসবাসের জায়গাটি পরিষ্কার করে দেয়। হাতিটি বুদ্ধের জন্য নিয়মিত পানীয় জলও সংগ্রহ করে আনত। সেবা দানের জন্যে সবসময় তৎপর থাকত। এভাবে হাতিটি নিজের ইচ্ছাতেই বুদ্ধের সেবায় নিয়োজিত থাকত। বন্যপ্রাণি হাতির এরূপ সেবাপরায়ণতা দেখে বনের এক বানরও বুদ্ধকে সেবা করতে আগ্রহী হয়। সে চেতনায় বানরটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে বুদ্ধকে দান করে। বুদ্ধ বানরের দেওয়া মধু সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। এতে বানর খুবই প্রীত হয়। মনের সুখে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে লাফাতে থাকে। বানরটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফানোর সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বুদ্ধ দিব্যচক্ষুতে দেখলেন যে, মধুদানের ফলে বানর মৃত্যুর পর দেবলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ভাদ্রপূর্ণিমা তিথিতে। এ অনন্য ঘটনাকে স্মরণ করে বৌদ্ধরা এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুসঙ্ঘকে মধু দান করেন।

এসব কারণে ভাদ্রপূর্ণিমাকে মধুপূর্ণিমা বলা হয়। এছাড়া, কৌশাম্বির ভিক্ষুরাও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কলহ ত্যাগ করেন এবং পারস্পরিক মধুময় সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

বানর বুদ্ধকে মধু দান করছে

এ পূর্ণিমায় যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তা প্রায় অন্যান্য পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের মতো। মধু দান করা এ পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ তিথিতে বৌদ্ধরা বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের উদ্দেশে মধু দান করে। বিহারে আগত উপাসক-উপাসিকারা পরস্পরকে মধু ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করে। এভাবে দান ও সেবার ঐতিহ্যকে ধারণ করেই মধু পূর্ণিমা পালন করা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

মধু পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

পাঠ : ৬

প্রবারণা পূর্ণিমা

এ পূর্ণিমা আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই প্রবারণা পূর্ণিমা। অন্যান্য পূর্ণিমার মতো এ পূর্ণিমা তিথির সঙ্গেও বুদ্ধের জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িত আছে। যেমন, এ পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ মাতাকে এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিংস স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত পালন সমাপ্ত হয়। এ পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ভিক্ষুগণ! বহুজনের মঙ্গলের জন্য, হিতের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো। প্রচার কর সেই ধর্ম যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ।' এ পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলা হয়। প্রবারণা শব্দের অর্থ হলো সন্তুষ্টি বা ইচ্ছার পূর্ণতা, উৎসব, বরণ করা, বারণ করা ইত্যাদি। কুশলসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা এবং অকুশলসমূহ বারণ করাই হচ্ছে প্রবারণা। বর্ষাবাসব্রতের সমাপ্তি এবং মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসবের সূচনা করে বলে প্রবারণাকে বৌদ্ধদের আনন্দের দিনও বলা হয়।

বর্ষাবাসব্রতের সমাপ্তি, কঠিন চীবর দান উৎসবের শুরু, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা করে পরিশুদ্ধিতা অর্জন, অভিধর্ম দেশনা করে তাবাতিংস স্বর্গ থেকে বুদ্ধের প্রত্যাবর্তন, বুদ্ধ কর্তৃক যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন প্রভৃতি কারণে প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধ জগতে একটি অনন্য স্মরণীয় উৎসব।

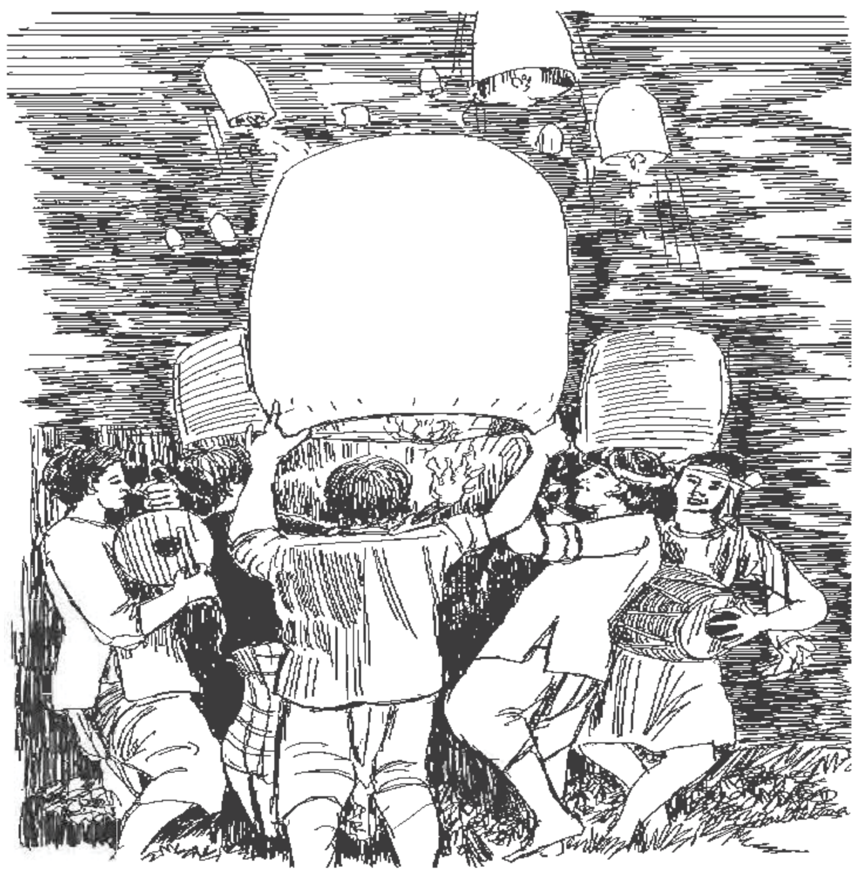

ফানুস উত্তোলন করছে

প্রবারণা পূর্ণিমা একটি উৎসবমুখর দিন। এদিনে ফানুস ওড়ানো হয়। বিশেষ করে, ফানুস বানানোর জন্য পূর্ণিমা তিথির কয়েকদিন আগে থেকেই বৌদ্ধগ্রামসমূহে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও প্রদীপ পূজার পর বৌদ্ধ বিহারে ফানুস ওড়ানোর উৎসব শুরু হয়। অনেকে বাড়ির উঠানেও ফানুস উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্বস্তরের লোক উপস্থিত হয় এবং ফানুস ওড়ানো উপভোগ করে। নানা রকম বাদ্যবাজনার তালে তালে, সংকীর্তনের ঝংকারে নেচে-গেয়ে বর্ণিল ফানুস আকাশে ওড়ানো হয়। রাতে এ দৃশ্য অপূর্ব মনে হয়। এভাবে প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

এ পূর্ণিমা উদ্‌যাপনে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, প্রত্যেক মানুষকে সর্বদা নির্দোষ ও পবিত্র থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। এজন্যে চেষ্টা করতে হবে। যেমন প্রবারণা পূর্ণিমায় বৌদ্ধভিক্ষুরা ভিক্ষুসীমায় বসে পরস্পরের কাছে দোষ-ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এটি হলো আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নিজের মন পবিত্র হয় এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদেরও দোষ-ত্রুটির জন্য পরস্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এতে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মনের রাগ ও হিংসা দূর হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রবারণা পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৭

মাঘী পূর্ণিমা

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহের মধ্যে মাঘী পূর্ণিমাও গুরুত্বপূর্ণ। এ পূর্ণিমার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহাপরিনির্বাণ লাভের ঘোষণা। এ তিথিতে বুদ্ধ নিজের আয়ু সংস্কার বিসর্জন বা মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলেছিলেন, 'এখন হতে তিন মাস পর আগামী বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।' এভাবে নিজের জীবন অবসানের দিনক্ষণ ঘোষণা করা সাধারণের জীবনে বিরল। জগতে হয়তো আর দ্বিতীয়টি নেই।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবন অবসানের ঘোষণার জন্য এই দিনটি শোকের বা দুঃখের মনে হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে এটি মহৎ ও মহান একটি দিন। কারণ, বুদ্ধ বলেছেন, উৎপন্ন সকল কিছুরই বিনাশ অনিবার্য। অর্থাৎ জন্ম হলেই মৃত্যু হবে। জগতের সকল কিছুই অনিত্য ও অনাত্মা নিয়মে বাঁধা। বুদ্ধ এই সত্যকে সাধনা ও প্রজ্ঞা দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তিনি সম্যক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি তাঁর আয়ু সংস্কার ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্য সকল পূর্ণিমা উৎসবের মতো মাঘী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানমালাও খুব সকাল থেকে শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে পঞ্চশীল ও উপোসথশীল গ্রহণ, বুদ্ধ পূজা, সমবেত উপাসনা, দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। এছাড়া, ধর্মালোচনা, সান্ধ্যকালীন বন্দনা ও পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিও আয়োজন করা হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. যে অনুষ্ঠানগুলো চান্দ্রবছরের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো ধর্মীয়......... বা .... ।

২. 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠান করতে হয় বছরের নির্দিষ্ট .... ।

৩. বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিই .... নামে খ্যাত।

৪. ভিক্ষুসঙ্ঘকে দুপুরের আহার দান করাকে .... বলে।

৫. ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিকেই বলা হয় .... ।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো	ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র
২. সকলের একাগ্রচিত্তে	জীবনের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য
৩. প্রকৃতির সাথে আমাদের	মহারাজ শীঘ্রই পুত্রসন্তান লাভ করতে যাচ্ছেন
৪. জ্যোতিষীরা বলেন	প্রধানত পূর্ণিমাকেন্দ্রিক
৫. বুদ্ধের প্রচারিত প্রথম ধর্মবাণীকে বলা হয়	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা উচিত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কোন মাসের পূর্ণিমা তিথিকে মধু পূর্ণিমা বলা হয়?

২. বুদ্ধ পূর্ণিমা কোন মাসে কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়?

৩. ফানুস উত্তোলন উৎসবের পরিচয় দাও।

৪. প্রবারণা পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন, লেখ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবের পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

২. বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের কারণসমূহ আলোচনা কর।

৩. প্রবারণা পূর্ণিমার শিক্ষা আমাদের জীবনে কী উন্নয়ন আনতে পারে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধের জীবনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কয়টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২. ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন হয় কেন?

ক. ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্য খ. সবার সাথে দেখা করার জন্য

গ. একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য ঘ. পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য

নিচের মডেলগুলো দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

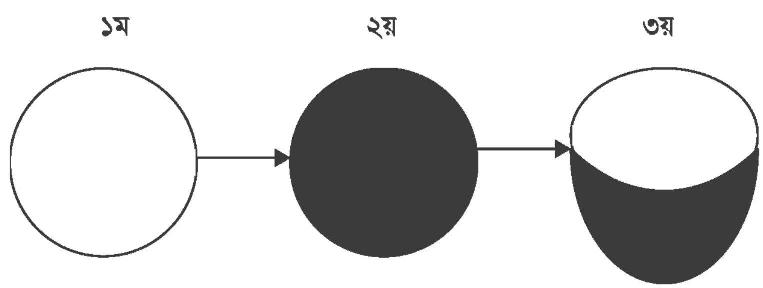

চিত্র : সময়ের ভিত্তিতে চাঁদের প্রকৃতি

৩. ১ম মডেলটি কী ইঙ্গিত বহন করছে?

ক. পূর্ণিমার খ. কৃষ্ণ অষ্টমীর

গ. শুক্লা অষ্টমীর ঘ. অমাবস্যার

৪. ৩য় মডেলের আলোকে গৃহীরা অনেকে কী করে থাকে?

ক. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন খ. অষ্টশীল গ্রহণ ও পালন

গ. তীর্থস্থান দর্শন ঘ. ধর্মীয় আলোচনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **ঘটনা-১**

পলাশ চাকমা তাঁর মা-বাবাকে নিয়ে এক পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাব্রত পালনের জন্য বিহারে সমবেত হলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ পূজা ও উপাসনার মাধ্যমে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন। দুপুরে ধ্যান সমাধির চর্চা করেন। ধর্মদেশনার একপর্যায়ে ভন্তে বলেন, এ পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ ও সারনাথের ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন।

ঘটনা-২

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাজরী মার্মা একদিন সন্ধ্যায় ফানুসবাতি উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগদান করে। কৌতূহলবশত সে তার বাবার কাছে জানতে চাইল, বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। উত্তরে বাবা বলেন, এ তিথিতে বুদ্ধ মাতাকে এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিংস স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। এছাড়া উক্ত দিবসে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস পালন সমাপ্তি হয়।

ক. বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের কথা কোন পূর্ণিমায় ঘোষণা করেন?

খ. বানরের মধুদানের ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ -এর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পূর্ণিমার ইঙ্গিত বহন করে। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ 'প্রবারণা পূর্ণিমার প্রতিচ্ছবি' -তুমি কি এর সঙ্গে একমত? যুক্তি প্রদর্শন কর।

২. অনিরুদ্ধ বড়ুয়া একজন চাকরিজীবী। ছুটির দিনের এক সকালে বিহারে গিয়ে তিনি সূত্র পাঠ ও বুদ্ধ কীর্তনের মাধ্যমে প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধ পূজা ও পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। দুপুর বারটার আগে ভিক্ষুসঙ্ঘকে পিণ্ডদান করেন এবং বিকালে ধর্মসভায় বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ তিনটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হয়।

ক. প্রবারণা শব্দের অর্থ কী?

খ. বৌদ্ধদের কাছে মাঘী পূর্ণিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের সাথে কোন পূর্ণিমার সাদৃশ্য রয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনিরুদ্ধ বড়ুয়া উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে কী সুফল লাভ করবে?
পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

চরিতমালা

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কেউ চিরদিন এ জগতে বেঁচে থাকে না। মানুষের কর্মই মানুষকে অমরত্ব দান করে। পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়েছে। এজন্য মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে এবং ভক্তি করে। তাঁদের নির্মল চরিত্র সহজেই মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়। জ্ঞানে, গুণে ও কর্মে তাঁরা মহান। এ সকল মহৎ ব্যক্তির জীবন সকলের অনুকরণীয়। মহৎ মানুষের জীবনকথা সৎ জীবন যাপনের প্রেরণা যোগায়। এ অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী পড়ব এবং তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
* থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারব।
* বৌদ্ধ মনীষীদের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মহৎ জীবন মানে মহৎ আদর্শ। এরূপ আদর্শসম্পন্ন জীবনচরিত মানুষকে আকৃষ্ট করে। আদর্শিক জীবন গঠনে প্রেরণা যোগায়। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এরূপ জীবন অর্জিত হয়। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। এতে অনেক অনুশীলনীয় বিষয় রয়েছে। যা সকল শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষকে সৃষ্টিশীল কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

জগতে সহজে কিছু লাভ করা যায় না। একাগ্রতা, অধ্যবসায়, ত্যাগ ও সংযম ছাড়া মহৎ জীবন গঠন করা সম্ভব নয়। চরিত্রের এই গুণগুলো জীবনের গতির সাথে ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠে দেখা যায়– তাদের জীবনেও সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না ও বেদনা ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনো আনন্দে বিভোর ও দুঃখে বিমর্ষ হয়ে আদর্শচ্যুত হননি। নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষাই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা ছিলেন মহৎ, মহোত্তম। আমাদের জীবনও সুন্দরভাবে গঠন করার লক্ষ্যে তাঁদের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এগুলো পাঠের মাধ্যমে আমাদের আদর্শিক চেতনা ও নৈতিকবোধ আরো সমৃদ্ধ হবে। তাই থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিপিটক সাহিত্যে অনেক নারী-পুরুষের জীবনী পাওয়া যায়, যাঁরা কর্মগুণে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হয়েছেন। ভিক্ষুদের থের, আর ভিক্ষুণীদের থেরী বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অনেক অবদান রয়েছে। থেরদের মধ্যে উপালি, আনন্দ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। থেরীদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, কৃশাগৌতমী, ক্ষেমা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এছাড়া, অনেকে গৃহীজীবন যাপন করে বৌদ্ধধর্মের সেবা করেছেন। ধর্ম প্রচার করতে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপাসক নামে খ্যাত। এঁদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা, সুজাতা, মল্লিকা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

কয়েকজন বিখ্যাত বৌদ্ধ থের-থেরীর নাম বল

পাঠ : ২

উপালি থের

উপালির জন্ম কপিলাবস্তুর রাজকুলের নাপিত বংশে। তাঁর গৃহী নাম ছিল পূর্ণ। তাঁর মাতার নাম ছিল মন্তানী। পূর্ণ ছিলেন অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কেম্বিল, ভদ্দীয়, আনন্দ, দেবদত্ত প্রমুখ রাজপুত্রের সহচর।

বুদ্ধ এক সময়ে অনুপ্রিয় নামক স্থানের আম্রবনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় কয়েকজন রাজপুত্র ঠিক করলেন তাঁরা একত্রে বুদ্ধের নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। এই ভেবে একদিন তাঁরা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পূর্ণও তাঁদের সঙ্গী হলেন। কপিলাবস্তু থেকে কিছু দূরে এসে তাঁরা থামলেন। তারপর সকলে নিজেদের মূল্যবান পোশাক খুলে পূর্ণের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা বললেন, 'পূর্ণ! এসব তোমাকে দিলাম। তুমি কপিলাবস্তুতে ফিরে যাও।' এই বলে রাজপুত্ররা চলে গেলেন। পূর্ণ তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন কপিলাবস্তুতে ফিরে গিয়ে রাজপুত্রদের সংসার ত্যাগের কথা কীভাবে জানাবেন? তিনি আরও ভাবলেন, নাপিত বংশে আমার জন্ম। এই মূল্যবান পোশাক আমার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া তাঁরা রাজপুত্র। তাঁদের বিপুল অর্থ, ধনসম্পদ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। এসব ছেড়ে তাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারলে আমি কেন পারব না? আমার তো কিছুই নেই। এই বলে তিনি মূল্যবান পোশাকগুলো একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে রাজকুমারদের পথে পা বাড়ালেন।

রাজপুত্ররা পূর্ণকে পোশাক ও অলঙ্কার খুলে দিচ্ছেন

ইতোমধ্যে অনুরুদ্ধ, ভৃগু, আনন্দ প্রমুখ রাজকুমারগণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রার্থনা জানালেন। এমন সময় পূর্ণও এসে বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তখন রাজকুমারগণ বুদ্ধকে অনুরোধ করে বললেন, 'ভন্তে! আগে পূর্ণকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহলে তাকে আমরা প্রণাম ও সম্মান করতে বাধ্য হবো। এতে আমাদের বংশমর্যাদা ও অহংকার দূর হবে।'

তাঁদের অনুরোধ শুনে বুদ্ধ খুশি হলেন। বুদ্ধ প্রথমে পূর্ণকে এবং পরে রাজকুমারদের প্রব্রজ্যা দান করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর পূর্ণের নাম হয় উপালি।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের কয়েকদিন পরই উপালি বুদ্ধের নিকট অরণ্যে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁকে বুদ্ধের সঙ্গে থেকে ধর্ম বিনয় অনুশীলন করতে বললেন। উপালি বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে অতি অল্প সময়ে অর্হত্ব ফল লাভ করতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের সঙ্গে থেকে উপালি বিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিনয়ে দক্ষতা দেখে বুদ্ধ তাঁকে 'বিনয়ধর' (নীতিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে ঘোষণা করেন।

একদিন উপোসথ দিবসে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উপালি ভিক্ষুদের নিম্নরূপ উপদেশ দান করেন : "প্রথম শিক্ষার্থী নব প্রব্রজিত কর্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে গৃহ হতে বের হয়ে শুদ্ধ জীবন যাপনকারী, শৌর্যবান কল্যাণমিত্রের নিকট উপস্থিত হবেন। সঙ্ঘের মধ্যে বাস করবেন। জ্ঞানী ভিক্ষু বিনয় শিক্ষা করবেন। যোগ্য অযোগ্য বিষয়ে সুদক্ষ হবেন এবং তৃষ্ণা উৎপাদন না করে বাস করবেন।"

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর আয়োজিত প্রথম মহাসঙ্গীতিতে উপালি বিনয় আবৃত্তি করেন। সেই মহাসঙ্গীতিতে পাঁচশত মহাজ্ঞানী অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উপালির আবৃত্তি করা বিনয়ের যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরে এগুলো বিনয়পিটক নামে সংকলিত করা হয়। বুদ্ধ প্রদত্ত বিনয়ধর অভিধার মর্যাদা রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এটি তাঁর জীবনের পরম গৌরব। প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষের জীবনে অনেক কিছু করা সম্ভব। এর জন্য বংশমর্যাদার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সৎ কর্ম করার প্রচেষ্টা। উপালি থের'র জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

অনুশীলনমূলক কাজ

উপালির সঙ্গে যাঁরা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন তাঁদের নামগুলো লেখ (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৩

আনন্দ থের

আনন্দের জন্ম শাক্যরাজ বংশে। তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। সিদ্ধার্থ ও আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনুরুদ্ধ, ভৃগু, ভদ্দীয় ও অন্যান্য শাক্য রাজকুমাদের সাথে তিনি একই দিনে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। আনন্দ সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং বুদ্ধের প্রধান সেবকের পদ লাভ করেছিলেন। তিনি ভালো বক্তা ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য ও সুন্দর ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন।

বুদ্ধের বয়স যখন ৫৫ বছর তখন তাঁর একজন স্থায়ী সেবকের দরকার হয়। সারিপুত্র, মৌদগল্লায়ন এবং আনন্দসহ অনেকেই বুদ্ধের সেবক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বুদ্ধ জানতেন, আনন্দ কল্পকাল ধরে এই পদের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে আসছেন। আনন্দ তখন মাত্র স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ তাই আনন্দ থেরকে সেবক পদে নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত আনন্দ সবসময় বুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন। তথাগত বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। এসব উপদেশ 'মহাপরিনির্বাণ' সূত্রে পাওয়া যায়।

মহাপরিনির্বাণে বুদ্ধ

আনন্দ থের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বুদ্ধের সেবা করতেন। বুদ্ধ যখন উপদেশ দিতেন তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সব উপদেশ মনে রাখতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রখর। তিনি বুদ্ধের যেকোনো উপদেশ প্রয়োজনে হুবহু অন্যকে বলতে পারতেন। এ জন্য তিনি 'ধর্মভাণ্ডারিক' ও 'শ্রুতিধর' ভিক্ষু নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অল্পকাল পরেই রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহাসঙ্গীতিতে একমাত্র অর্হৎ ভিক্ষুদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তবে বুদ্ধের সেবক ও প্রতিনিধি হিসেবে আনন্দের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। এ আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দ মহাসঙ্গীতির পূর্বরাতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সেই রাতেই তিনি অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। অর্হত্ব লাভ করে তিনি ভিক্ষুদের অনেক উপদেশ প্রদান করেন। নিম্নে দুটি উপদেশ তুলে ধরা হলো :

১। কর্কশ বাক্যভাষী, ক্রোধী, অহংকারী এবং সংঘভেদকারী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না,
তাদের সঙ্গী হওয়া উচিত নয়।

২। শ্রদ্ধাবান, শীলবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সঙ্গ উত্তম।

এদিকে মহাসঙ্গীতি উপলক্ষে সম্মেলন কক্ষে সকল অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হন। শুধু আনন্দ থের ছিলেন অনুপস্থিত। মহাসঙ্গীতি শুরু হলো। হঠাৎ সকলেই দেখলেন আনন্দ তাঁর আসনে বসে আছেন। সকলের মন খুশিতে ভরে উঠল। কথিত আছে তিনি আকাশপথে এসে তাঁর জন্য রাখা নির্দিষ্ট আসনে আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম মহাসঙ্গীতিতে আনন্দ ধর্ম (সূত্র ও অভিধর্ম) আবৃত্তি করেছিলেন।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় আনন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মহারাজ শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে এতে সম্মত হননি। পরে আনন্দের প্রবল অনুরোধে নারীদেরও সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেন। সে সময়ে নারীদের ভিক্ষুণী পদের মর্যাদা প্রদান করা খুবই কঠিন ছিল। নারীদের গৃহে থাকাই ছিল সামাজিক প্রথা। তাই বলা হয় মাতৃজাতিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিতকরণে আনন্দ থের'র ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ
আনন্দ থের'র দুটি উপদেশ লেখ

পাঠ : ৪

কৃশা গৌতমী থেরী

বুদ্ধের সময়ে কৃশা গৌতমী শ্রাবস্তী নগরের এক গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে অভিহিত হন। তাঁর বিবাহিত জীবনে তিনি সুখ লাভ করতে পারেননি। অনাদর অবহেলায় কেটেছে তাঁর জীবন। অসময়ে তাঁর স্বামীও মৃত্যুবরণ করেন। লোকে তাঁকে অনাথা বলত। কিন্তু এক পুত্রসন্তান প্রসব করে তিনি সম্মান লাভ করেন। পুত্রটিই ছিল তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা। পুত্রটি বড় হয়ে ক্রমে কৈশোরে উত্তীর্ণ হলে হঠাৎ তারও মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে পাগল হয়ে যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে পাগলের মতো তিনি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে লাগলেন। সকলের কাছে মৃত সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ঔষধ ভিক্ষা চাইলেন। ঔষধ কেউ দিতে পারলেন না। বরং নগরবাসী কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে ভর্ৎসনা করলেন। কৃশা গৌতমী কারো কথাতেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সন্তানকে বাঁচানোর আশায় তিনি ছুটে চললেন প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে। অবশেষে এক মহৎ ব্যক্তি তাঁকে তথাগত বুদ্ধের কাছে গিয়ে ঔষধ প্রার্থনা করতে বললেন।

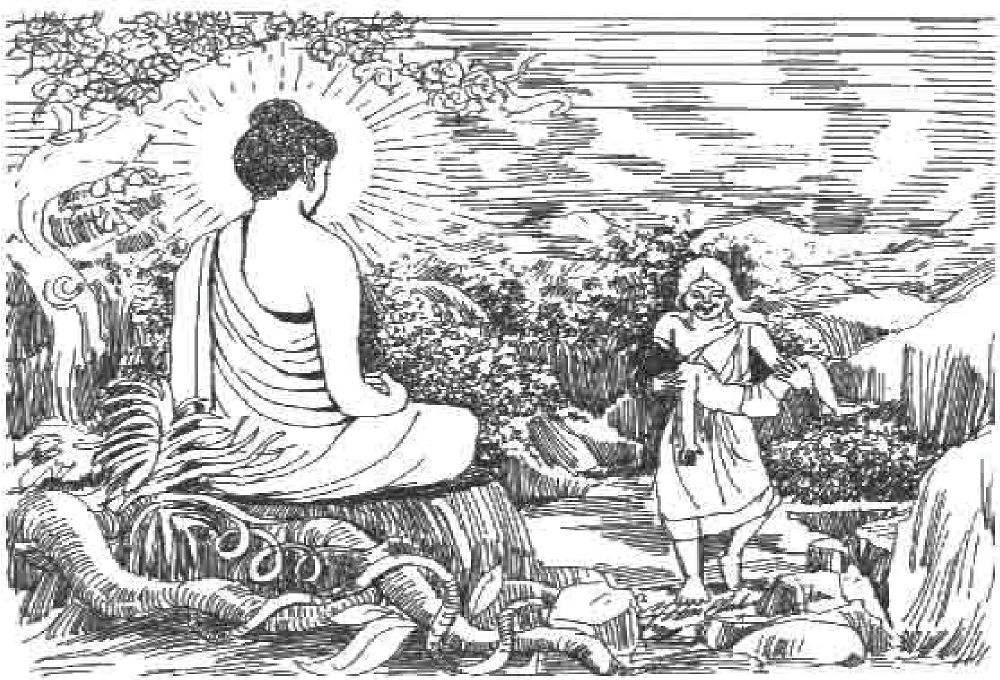

মৃত ছেলেকে কোলে নিয়ে কৃশা গৌতমী বুদ্ধের কাছে যাচ্ছেন

অতঃপর কৃশা গৌতমী মৃত সন্তান কোলে নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে তিনি বুদ্ধকে বললেন, 'ভগবান! আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিন।' বুদ্ধ কৃশা গৌতমীর দিকে তাকালেন এবং ধ্যান চেতনায় দেখলেন কৃশা গৌতমীর পূর্বজন্মের অনেক সুকৃতি আছে। কিন্তু এ জন্মের নানাবিধ কর্ম ও কর্মফলে তার হৃদয় কষ্টে ভরপুর। বুদ্ধ তার মানসিক অশান্তি দূর করার জন্য তাঁকে বললেন, 'নগরে গিয়ে এমন একটি ঘর থেকে সরিষাবীজ নিয়ে এসো যে ঘরে কখনো কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি।' বুদ্ধের কথা শুনে কৃশা গৌতমী কিছুটা শান্ত হন এবং মৃত পুত্রকে বুকে নিয়ে তিনি নগরে প্রবেশ করেন। তিনি প্রতিটি ঘরের দরজায় গিয়ে সরিষাবীজ ভিক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ঘরে কোনো মৃত্যু ঘটেছে কি না। সকল ঘরে একই উত্তর পেল, এখানে কত মৃত্যু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, কোনো ঘরই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত নয়। তিনি বুঝতে পারলেন, 'জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। সর্ব বস্তু অনিত্য।' অতঃপর পুত্রের সৎকার করে তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরে যান। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, 'গৌতমী! সরিষাবীজ পেয়েছ কি? কৃশা গৌতমী বললেন, 'ভগবান! সরিষাবীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষা দিন।' তখন বুদ্ধ তাকে বললেন, 'বন্যার স্রোত যেমন গ্রাম, নগর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ভোগবিলাসে রত মানুষও মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়।' বুদ্ধের উপদেশ শুনে কৃশা গৌতমী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি খুব ভালোভাবে ভিক্ষুণী জীবনের নিয়ম পালন করেন। সকল প্রকার লোভ, হিংসা, মোহ, তৃষ্ণা ক্ষয় করে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধ তাঁকে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। স্বীয় সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তিনি অনেক গাথা ভাষণ করেছিলেন। তাঁর কিছু উপদেশ নিচে তুলে ধরা হলো :

১) সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা জ্ঞানীগণ প্রশংসা করেন। সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে জ্ঞানী হওয়া যায়।

২) সৎ মানুষের অনুসরণ করো। এতে জ্ঞান বর্ধিত হয়।

৩) চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো।

৪) আমি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, নির্বাণ উপলব্ধি করেছি।

৫) আমি বেদনা মুক্ত, ভার মুক্ত। আমার চিত্ত সম্পূর্ণ মুক্ত।

অনুশীলনমূলক কাজ
কৃশা গৌতমী কীভাবে বুঝলেন যে সকলে মৃত্যুর অধীন? বর্ণনা কর

পাঠ : ৫
অভিরূপা নন্দা

হিমালয়ের পাদদেশে ছিল কপিলাবস্তু রাজ্য। এই রাজ্যে শাক্য জাতি বাস করত। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্যদের রাজা। শাসনকার্য পরিচালনায় সুবিধার জন্য রাজ্যটি কয়েকজন নায়কের অধীনে বিভক্ত ছিল। তেমনি এক নায়ক ছিলেন ক্ষেমক। নন্দা ছিলেন ক্ষেমকের প্রধান স্ত্রীর কন্যা। নন্দা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় অভিরূপা নন্দা।

নন্দা বিবাহযোগ্যা হলে বহু ধনী ব্যক্তির পুত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। অনেক বিচার বিবেচনা করার পর নন্দা এক শাক্য যুবককে পছন্দ করলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সেই দিনই সেই শাক্য যুবকের মৃত্যু হয়। সমাজে তখন তা অমঙ্গল হিসেবে বিবেচিত হতো। নন্দার মা-বাবা ও ভীষণ মর্মাহত হন। তাঁরা ঠিক করলেন নন্দাকে সংসারধর্মে আবদ্ধ না রাখতে। অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য তাঁকে প্রব্রজিত করলেন। প্রব্রজিত হলেও নন্দা তাঁর শরীরের রূপের জন্য খুব অহংকার করতেন। মস্তক মুণ্ডিত করে ভিক্ষুণীর বেশ গ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পরিবারের সিদ্ধান্তে বাধ্য হয়ে নন্দা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর নন্দার নতুন জীবন শুরু হলো। নন্দা এখন ভিক্ষুণী। কিন্তু ভিক্ষুণী হলেও তিনি রূপের অহংকার করতেন। উপদেশ শোনার জন্য প্রতিদিন অনেক ভিক্ষুণী বুদ্ধের নিকট যেতেন। কিন্তু নন্দা বুদ্ধের সামনে যেতে ভয় পেতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, বুদ্ধ তাঁর মনোভাব জেনে তাঁকে সকলের সামনে ভর্ৎসনা করতে পারেন। এই ভয়ে তিনি সবসময় বুদ্ধকে এড়িয়ে চলতেন। বুদ্ধ জানতেন, নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত। তিনি নন্দাকে ডেকে আনেন। সে সময় বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে নন্দার চেয়ে অপরূপ সুন্দরী নারীকে উপস্থিত করেন। যাঁর সৌন্দর্য দেখে নন্দা হতভম্ব হয়ে যান। এক দৃষ্টিতে নন্দা চেয়ে রইলেন সেই সুন্দরী নারীর দিকে। বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে সুন্দরী নারীকে পুনরায় বৃদ্ধ, জরা, শীর্ণ অবস্থায় পরিণত করলেন। সেই দৃশ্য নন্দার মনে আঘাত করল। তাঁর রূপের মিথ্যা অহংকার নিমিষেই ধ্বসে হয়ে গেল। তখন বুদ্ধ তাঁকে অহংকার পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, রূপ ক্ষণস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই চিরস্থায়ী। অতঃপর, তিনি তৃষ্ণামুক্ত হয়ে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন এবং উপদেশ স্বরূপ বলেন, 'এই দেহ অশুচি এবং ব্যাধির আলয়। এতে অহংকারের কিছুই নেই। অনিষ্টকর অহংকার পরিত্যাগ কর। মনকে শান্ত ও সংযত কর।'

নন্দার জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, রূপের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। সৎ জ্ঞানই মানুষের পরম সম্পদ।

ধ্যানস্থ এক ভিক্ষুণী

অনুশীলনমূলক কাজ

রূপ ক্ষণস্থায়ী – বুদ্ধ অভিরূপা নন্দাকে কীভাবে এ শিক্ষা দিলেন বর্ণনা কর

অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে অভিরূপা নন্দা কী বলেছিলেন

পাঠ : ৬

অতীশ দীপঙ্কর

যুগে যুগে বাংলাদেশে বহু জ্ঞানী পণ্ডিত ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজ গুণে বিশ্বের ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। অমর হয়ে আছেন মানুষের মনের মধ্যে। সেই রকম এক মনীষী অতীশ দীপঙ্কর। অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের লোক ছিলেন। ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁর জন্ম। এটি বর্তমানে ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। অতীশের বাস্তুভিটাটি এখনও বিদ্যমান।

অতীশ দীপঙ্কর

বজ্রযোগিনীর সেই ঐতিহাসিক স্থানটিতে অতীশ দীপঙ্করের নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি করেছে 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' নামক একটি সংগঠন। তিব্বতসহ অনেক দেশ থেকে অনেক লোক এই বাস্তুভিটাটি দেখতে আসেন।

অতীশের পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী। মাতার নাম প্রভাবতী। জন্মের পর মা-বাবা আদর করে তাঁর নাম রাখেন চন্দ্রগর্ভ। তাঁদের পরিবার ছিল অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। বজ্রযোগিনী গ্রামে এখনও তাঁর বসতভিটার চিহ্ন রয়েছে। সেখানকার লোকেরা সেই স্থানটিকে বলেন নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা। চন্দ্রগর্ভ শৈশবকাল থেকেই খুবই মেধাবী ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। খুব অল্প সময়েই তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাছাড়া, চিকিৎসাশাস্ত্র ও কারিগরি বিদ্যায়ও তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য চলে গেলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে থেকে নানা শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন।

চন্দ্রগর্ভ ঊনত্রিশ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। একত্রিশ বছর বয়সে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুবর্ণ দ্বীপে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল শতাধিক শিষ্য। সেখানে তিনি দীর্ঘ বার বছর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

তারপর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দেশে ফিরে আসেন। তখন বাংলাদেশের রাজা ছিলেন মহীপাল। রাজার অনুরোধে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও ছিলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে নানারকম অনাচার প্রবেশ করে। তিব্বতের রাজা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান। রাজার ধারণা ছিল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে যেতে পারলে সে দেশের মানুষের প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটবে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজার আমন্ত্রণে প্রথম সাড়া দেননি। কিন্তু পরে তিনি রাজি হন। আনুমানিক ১০৪১ সালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের উদ্দেশে রওনা হন।

অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা

সে সময় তিব্বতে যাওয়ার পথ সুগম ছিল না। অনেক কষ্টে হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে প্রবেশ করেন। তিব্বত সীমান্তে অপেক্ষারত রাজপ্রতিনিধিরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিপুল সংবর্ধনা জানান। তিনি তিব্বতের প্রধান প্রধান শহর, নানা গ্রাম ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হতো। তিব্বতের লোকেরা তাঁর ধর্মদেশনা শুনে আস্তে আস্তে ফিরে পেল প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা। ধর্মে যেসব অনাচার প্রবেশ করেছিল সেগুলো তারা পরিত্যাগ করল।

বিক্রমশীলা ত্যাগ করার সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বলে গিয়েছিলেন তিব্বতে তিনি মাত্র তিন বছর থাকবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে দেশে আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তিব্বতেই থেকে গেলেন। তিব্বতের মানুষকে তিনি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিব্বতিরাও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতি ভাষায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া অনেক বই সংস্কৃত থেকে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন। চিকিৎসা ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিব্বতের ঞাথাং বিহারে তাঁকে 'অতীশ' উপাধি প্রদান করা হয়। 'অতীশ' খুব সম্মানজনক উপাধি। ১০৫৪ সালে তিব্বতের ঞাথাং বিহারে ৭৩ বছর বয়সে এই মহাপণ্ডিত মৃত্যুবরণ করেন। অতীশের দেহভস্ম সেই বিহারে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে সংরক্ষিত আছে। ১৯৭৮ সালে চিন থেকে তাঁর দেহভস্মের কিছু অংশ বাংলাদেশে আনা হয়। ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে এগুলো সংরক্ষিত আছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি পরিদর্শনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি কর (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৭

মনীষীদের জীবনীর অনুসরণীয় দিক

কোনো মহৎ জীবনই সহজে গড়ে ওঠে না। এর জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে হয়। যাঁরা এরূপ কীর্তিমান জীবন গঠনে সক্ষম হন তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। যুগ-যুগান্তরের মানুষ তাঁদের আদর্শ ও গুণাবলি অনুশীলন করেন। মহৎ মানুষের জীবনাদর্শে আমাদের অনুসরণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই জীবনীসমূহ পাঠ করে শুধু মানসিক আনন্দ লাভ করলেই হবে না, আদর্শিক দিকগুলোও আমাদের অনুশীলন করতে হবে। আবেগে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। একাগ্র অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমেই একমাত্র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। গৌতমবুদ্ধ নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণে জীবনকে সুন্দর করার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে বক্কলি নামে একজন মুনি ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুবই ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা বুদ্ধের জ্যোতির্ময় দেহাবয়বের দিকে ভক্তিচিত্তে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে এক সময় তাঁকে ডেকে বললেন– এই ধ্বংসশীল দেহাবয়বের দিকে চেয়ে থেকে ফল কী? নীতি-আদর্শ অনুসরণ করো। আবেগ ত্যাগ করো। নিজের মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোক উৎপাদনের বীজ বপন করো। নিজেকে আলোকময় করে গড়ে তোলো। বুদ্ধের এই উপদেশ লাভ করে বক্কলি ঋষি সাধনায় রত হলেন এবং অচিরেই অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা জানা যায়। তখন বুদ্ধ উরুবিল্ব নগরে পরিভ্রমণ করছিলেন। সে সময় উরুবিল্ব বনে বাস করতেন তিনজন ঋষি। উরুবেলাকশ্যপ, নদীকশ্যপ ও গয়াকশ্যপ তিন ভাই। তাঁরা নিজ নিজ শিষ্য নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে সেখানে বাস করতেন। তাঁরা কারো নীতি অনুসরণ করতেন না। নিজেদের ধারণা মতে গরমে ও আগুনে তপ্ত হয়ে এবং ঠাণ্ডায় পানিতে ডুবে থেকে দুঃখ মুক্তির চেষ্টা করতেন। বুদ্ধের সাথে সাক্ষাত হলে বুদ্ধ তাঁদের উপদেশ দেন।

বুদ্ধ বলেন– পানিতে ভিজে বা রোদে পুড়ে মানুষ পরিশুদ্ধ হতে পারে না। বুদ্ধ তাঁদের কাছে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বর্ণনা করেন। তারপর বলেন– জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হলে আদর্শ ও নৈতিকতার অনুশীলন আবশ্যক। পরে তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রহ্মচয্য পালনের মাধ্যমে মুক্তি অন্বেষণে ব্রতী হন।

সুতরাং মহৎ জীবন গঠনের জন্য মহৎ আদর্শের অনুসরণ আবশ্যক। আমাদের জীবনকে খ্যাতিসম্পন্ন ও জ্যোতির্ময় করার জন্য আলোকিত ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীরা আদর্শের পথিকৃৎ। তাঁদের জীবনচরিত থেকে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অধ্যবসায়, সংযম ও অনুশীলনীয় নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাঁদের জীবনীর এই অনুসরণীয় দিকগুলো সঠিকভাবে অনুশীলন করতে পারলে সকলের জীবন সার্থক ও সফল হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. উপালির জন্ম কপিলাবস্তুর রাজকুলের .... বংশে।

২. বুদ্ধ উপালিকে .... বলে ঘোষণা করেন।

৩. রাজগৃহের .... প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

৪. কৃশা গৌতমী বুঝতে সমর্থ হলেন জন্মের সাথে .... একই সূত্রে গাথা।

৫. এই শরীর .... আর .... আলয়।

৬. অতীশ দীপঙ্কর .... খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৭. অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের .... গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আনন্দ থের'র দুটি উপদেশ লেখ।

২. কৃশা গৌতমীর উপদেশগুলো কী কী?

৩. অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে অভিরূপা নন্দা কী বলেছিলেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপালি থের কীভাবে বিনয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বর্ণনা কর।

২. আনন্দ থের কীভাবে বুদ্ধের প্রধান সেবকের পদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন? তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩. কৃশা গৌতমী জীবনের বাস্তবতা থেকে কী শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন আলোচনা কর।

৪. অভিরূপা নন্দা কীভাবে বুঝতে পারলেন রূপ ক্ষণস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই চিরস্থায়ী।

৫. পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের জীবন ও কর্ম আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চন্দ্রগর্ভ কত বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন?

ক. ১৬ খ. ১৯

গ. ২৭ ঘ. ২৯

২. উপালি থের'র জীবনী থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়-

i. সৎকর্ম করার প্রচেষ্টার

ii. সূত্র আবৃত্তির প্রচেষ্টার

iii. নির্লোভ হওয়ার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুভদ্রা তঞ্চঙ্গা রূপে, চেহারায় ও চরিত্রে অনন্যা। যথাসময়ে তাঁর পছন্দ করা এক রূপবান যুবকের সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর সংসারজীবন ক্ষণস্থায়ী হয়। পরবর্তী সময়ে চিত্ত পরিবর্তন করে তিনি বিহারমুখী হন এবং ব্রহ্মচর্য পালনে সচেষ্ট হন।

৩. সুভদ্রা তঞ্চঙ্গার সাথে পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. মহাপ্রজাপতি গৌতমী খ. কৃশা গৌতমী

গ. অভিরূপা নন্দা ঘ. মল্লিকা

৪. ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে সুভদ্রা তঞ্চঙ্গা করতে পারেন-

i. নতুন জীবন শুরু

ii. তৃষ্ণার ক্ষয়

iii. মনকে শান্ত ও সংযত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পটাচারা ধনী পরিবারের মেয়ে। কিন্তু বিয়ে করেন এক গরিবের ছেলেকে। একদিন তার বাবার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। একদিন স্বামী-সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে যাওয়ার পথে স্বামীকে সাপে কাটল। তখন তিনি একা দুই সন্তানকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। মাঝপথে ছোট নদী থাকায় প্রথমে তিনি ছোট শিশুটি নিয়ে নদী পার হলেন। বড় শিশুকে নেয়ার জন্য তিনি অপর পারে আসছিলেন। কিন্তু তিনি যখন নদীর মাঝখানে তখন বড় শিশুটি দেখল ছোট শিশুটিকে ঈগল পাখি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঈগল পাখিকে তাড়াতে চিৎকার করতে করতে বড় ছেলে নদীতে ঝাঁপ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর পানিতে তলিয়ে গেল। স্বামী-সন্তান হারিয়ে একসময় বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধের আশীর্বাদে তিনি স্বস্তি ফিরে পেলেন। পরবর্তীতে তিনি ভিক্ষুণী পথ অবলম্বন করেন।

ক. উপালি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

খ. তিব্বতের রাজা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানালেন কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পটাচারার ঘটনায় চরিতমালার কার জীবনের ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পটাচারার অনুসৃত পথে কি নির্বাণ লাভ সম্ভব?'— পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. ক্ষেমা তাঁর রূপ নিয়ে অহংকারী ছিলেন। তাঁর রূপের অহংকার বুদ্ধ কর্তৃক নিন্দিত হবে মনে করে ক্ষেমা বুদ্ধের সম্মুখে যেতেন না। একদিন ক্ষেমা বুদ্ধের কাছে যেতে সম্মত হলে বুদ্ধ একটি আলৌকিক দৃশ্য সৃষ্টি করেন। দৃশ্যটি হলো স্বর্গের এক অপ্সরা তালপাতার পাখা নিয়ে বুদ্ধকে বাতাস করছেন। তখন ক্ষেমা অবাক বিস্ময়ে স্বর্গের অপ্সরাকে দেখতে লাগলেন। বুদ্ধের ইচ্ছা অনুযায়ী অপ্সরা একসময় যৌবন থেকে মধ্য বয়সে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তাঁকে বার্ধক্য গ্রাস করল। অপ্সরার দাঁত নেই, চামড়া কুঁচকানো, চুল পাকা। একসময় বৃদ্ধা অপ্সরা মাটিতে পড়ে গেল। তখন ক্ষেমা অনুতপ্ত হয়ে বললেন, হায়, অপরূপ সৌন্দর্যের এই পরিণতি! আমার দেহেরও একদিন এ পরিণতি হবে।

ক. বুদ্ধের সেবক কে ছিলেন?

খ. পূর্ণকে আগে প্রব্রজ্যা দেওয়া হলো কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনীটি চরিতমালার কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আমার দেহেরও এ পরিণতি হবে'—চরিতমালার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

নবম অধ্যায়

জাতক

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনীগুলো জাতক নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে জাতকের গল্প ও উপদেশগুলোর প্রভাব অপরিসীম। জাতকের গল্পের শেষে যে উপদেশ থাকে তা থেকে আমরা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে পারি। এছাড়া জাতক পাঠে প্রাচীন ভারতের মানুষের জীবন যাত্রা, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভূগোল, পরিবেশ, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কেও জানা যায়। তাই জাতক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা জাতক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* জাতক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব।
* জাতক কাহিনী বলতে পারব।
* জাতকের উপদেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
* নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

জাতক পরিচিতি ও জাতকের সংখ্যা

জাতক শব্দটি 'জাত' শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'জাত' শব্দের অর্থ হলো উৎপন্ন, উদ্ভূত, জন্ম ইত্যাদি। সুতরাং জাতক শব্দের অর্থ যিনি উৎপন্ন বা জন্ম লাভ করেছেন। বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে শিষ্যদের তাঁর অতীত জন্মের কাহিনী বর্ণনা করতেন। গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের ঐ কাহিনীগুলোকে জাতক বলা হয়। এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। বুদ্ধ হওয়ার জন্য জন্ম-জন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করে পরিশুদ্ধি অর্জন করতে হয়। জাতক পাঠে জানা যায়, জন্ম-জন্মান্তরে গৌতম বুদ্ধ রাজা, মন্ত্রী, দেবতা, পশু-পাখি প্রভৃতি নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিটি জন্মে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে অভিহিত হন। বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে কুশলকর্ম সম্পাদন করতেন। এক কথায় বলা যায়, গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বরূপে অতীত জন্মবৃত্তান্ত ও ঘটনাবলি সমূহ 'জাতক কাহিনী' নামে খ্যাত।

মূলত জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। গৌতম বুদ্ধ ৫৫০তম জন্মে বোধিজ্ঞান লাভ করে 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত হন। শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত জাতক গ্রন্থে মোট ৪৪৭টি জাতক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে ৩টি জাতক কাহিনী কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

'জাতক' শব্দের অর্থ কী?

পাঠ : ২
নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব

সৎ এবং সুন্দর পথে পরিচালিত জীবনই হলো আদর্শ জীবন। আদর্শবান ব্যক্তি সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। মৃত্যুর পরও নীতিবান এবং আদর্শবান ব্যক্তির কথা মানুষ যুগে যুগে স্মরণ করে থাকে। তাই আমাদের সকলের উচিত অনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। কেননা নীতি-আদর্শহীন ব্যক্তি পশুর সমান। আদর্শ ও নৈতিক জীবন কীভাবে গঠন করতে হয় তা জাতক পাঠে জানা যায়।

জাতকের গল্পগুলো হিতোপদেশমূলক। এগুলো রূপকথার গল্প নয়। ভগবান বুদ্ধ ভালো কাজের সুফল এবং খারাপ কাজের কুফল বোঝানোর জন্য জাতক কাহিনীগুলো বলতেন। তাই সুন্দর মানবজীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতক কাহিনীগুলো ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো বুঝতে সাহায্য করে। ভালো কাজে উৎসাহ যোগায়। উদার চিত্তে দান দিতে শিক্ষা দেয়। শীলবান বা চরিত্রবান, দয়াবান, নীতিবান, সত্যবাদী, ক্ষমাপরায়ণ, মৈত্রীপরায়ণ এবং পরোপকারী হতে শিক্ষা দেয়। প্রাণী হত্যা, মিথ্যা বলা, চুরি, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। কায়, বাক্য এবং মন সংযত করে। সম্যক জীবিকা অবলম্বন করতে উৎসাহ যোগায়। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সহায়তা করে। ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে। পরমত সহিষ্ণু এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন করে তোলে। বলা যায়, নৈতিক এবং আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম। তাই প্রত্যেকের জাতকের শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতকের কাহিনী থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৩
কপোত জাতক

পুরাকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পায়রারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বারানসীর লোকেরা পুণ্য কামনায় পাখিদের সেবা করত। পাখিদের জন্য ঘরের বাইরে ও ভিতরে নানা জায়গায় ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখত। পায়রারূপী বোধিসত্ত্ব সে রকম একটি ঝুড়িতে রাতে থাকতেন। সেখান থেকে প্রতিদিন সকালে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন। খাবার খেয়ে সন্ধ্যার সময় সেই ঝুড়িতে এসে শয়ন করতেন।

একদিন এক কাক ওই রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রান্নার চমৎকার গন্ধ পেল। সে উঁকি মেরে দেখল ভিতরে মাছ-মাংস রান্না হচ্ছে। লোভী কাক বাইরে বসে ভাবতে লাগল, কেমন করে ঐ মাছ-মাংস খাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় পায়রাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে ভাবল, পায়রাটার সঙ্গে ভাব করেই উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

পরদিন ভোরে বোধিসত্ত্ব ঘুম থেকে উঠে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। কাকও তাঁর পেছন পেছন ছুটলো। বোধিসত্ত্ব বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে চললে কেন?" কাক বলল, "আপনার চালচলন আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এখন থেকে আপনার অনুচর হয়ে থাকব।"

পাচক ও লোভী কাক

তার পর থেকে কাকটি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে থাকতে লাগল। পাচক দেখল পায়রার সঙ্গে একটি কাক এসে থাকছে। তাই সে কাকের জন্যও একটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিল। সেই থেকে কাকটিও সেই বাড়িতে থাকতে লাগল। একদিন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে প্রচুর মাছ-মাংস রান্না হচ্ছিল। তা দেখে কাকের খুব লোভ হলো। সে ঠিক করল পরদিন সে খাবার খুঁজতে বাইরে যাবে না। এই ভেবে সে সারারাত অসুস্থতার ভান করে পড়ে রইল। সকালে সে ঠিক করল, পায়রার সঙ্গে খাবার খেতে বাইরে যাবে না। বোধিসত্ত্বের মনে সন্দেহ হলো। তাই তিনি কাককে বললেন, "বেশ, তুমি থাকো। তবে সাবধান, লোভে পড়ে কোনো কিছু করে বসো না।" কাককে উপদেশ দিয়ে বোধিসত্ত্ব নিজের খাবার খুঁজতে চলে গেলেন।

এদিকে পাচক রান্না শুরু করল। রান্নার হাঁড়ি থেকে বাষ্প বেরুনোর জন্য হাঁড়ির মুখ একটু খোলা রাখল। একটা হাঁড়ির মুখ ঝাঁঝরি দিয়ে ঢেকে দিল। রান্নার সুগন্ধে চারদিক ম ম করতে লাগল। এ সময় পাচক গায়ের ঘাম শুকানোর জন্য রান্নাঘরের বাইরে বারান্দায় গেল। কাক ঠিক সে সময় ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁড়ির ওপর ঝাঁঝরিতে গিয়ে বসল। অমনি ঝাঁঝরিটা মাটিতে পড়ে ঝন্ ঝন্ শব্দ হলো। পাচক সেই শব্দ শুনে ব্যাপার কী জানার জন্য রান্নাঘরে ছুটে এলো।

এসে দেখল কাক মাংস খাওয়ার চেষ্টা করছে। পাচক সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কাকটিকে ধরে ফেলল। একে একে সারা শরীরের পালক তুলে নিল। গায়ে আদা ও নুন মেখে দিল। তারপর তাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে রাখল। যন্ত্রণায় কাক ছটফট করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যায় ফিরে এসে কাককে দেখে সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ভাবলেন, লোভী কাক আমার কথা না শোনায় এই ফল পেয়েছে। তারপর তিনি একটি গাথা বললেন। গাথাটির অর্থ হলো :

'উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা শোনে না। এ জন্য তার ওপর বিপদ নেমে আসে। কাক তার প্রমাণ।'

বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করে নিজে নিজে বললেন, আমি আর এখানে থাকতে পারি না। তারপর তিনি সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

কাক সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। পাচক ঝুড়িসহ কাকটি ফেলে দিলো।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

অনুশীলনমূলক কাজ
কাক কেন পায়রার সাথে বন্ধুত্ব করলো?
ধূর্ত কাকের পরিণতি বর্ণনা কর

পাঠ : ৪
কালকর্ণী জাতক

পুরাকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। কালকর্ণী নামে তাঁর এক মিত্র ছিল। তিনি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ছেলেবেলায় এক সাথে খেলাধুলা করতেন। তাঁরা একই গুরুর কাছে পড়াশোনা করেছিলেন। এক সময় কালকর্ণী সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েন। সেই থেকে তিনি বোধিসত্ত্বের কাছে আশ্রয় নেন। বোধিসত্ত্ব তাঁকে বেতন দিয়ে নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

কালকর্ণী বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। বোধিসত্ত্ব সব সময় কালকর্ণীকে এটা-সেটা করতে বলতেন। কাছে বসাতেন। অন্য বন্ধুরা একদিন বোধিসত্ত্বকে একা ডেকে বললেন, আপনার ওই বন্ধুর কালকর্ণী নাম ভালো লাগে না। ওই নাম শুনলে যম পর্যন্ত পালিয়ে যায়। লোকটি আপনার সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নয়। চালচুলোহীন একটি লোককে আপনি বড় বেশি সম্মান দিচ্ছেন। কালকর্ণী শব্দের অর্থ যেমন অলক্ষ্মী তেমনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘরে অলক্ষ্মী বাসা বাঁধছে। বোধিসত্ত্ব তাঁদের বললেন, নাম দিয়ে কী আসে-যায়। নাম দিয়ে কারও চরিত্রের গুণাগুণ মাপা যায় না। কাজেই ওর নাম শুনলেই অমঙ্গল হবে এ ধারণা ঠিক নয়। নামের জন্য বাল্যবন্ধুকে ত্যাগ করি কীভাবে?

বোধিসত্ত্ব একদিন কাজ উপলক্ষে গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে এক রাত থাকতে হবে। তাই তিনি বাড়ি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কালকর্ণীর হাতে দিয়ে গেলেন। এই সুযোগে ডাকাতরা ভাবল রাতে বোধিসত্ত্বের বাড়ি লুট করবে। এই ভেবে তারা বোধিসত্ত্বের বাড়ি ঘেরাও করল। কালকর্ণীর সন্দেহ হলো রাতে ডাকাতেরা আসতে পারে। তাই তিনি বাড়ির লোকজনদের ডেকে, 'ঢাক-ঢোল বাজাও, শাঁখ বাজাও' বলে বাড়ি তোলপাড় করে তুললেন। বাড়ির চাকর বাকর সবাই মিলে তাই শুরু করল। এ-দিকে ডাকাতরা ভাবল বাড়িতে অনেক লোক আছে। নিশ্চয়ই তাই হবে। নইলে এত হৈচৈ চিৎকার কেন? বোধ হয় শ্রেষ্ঠী ফিরে এসেছেন। এই ভেবে ভয়ে তারা লাঠিসোটা, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল।

কালকর্ণীর বুদ্ধিমত্তায় ডাকাত পালাচ্ছে

ডাকাতদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র দেখে বোধিসত্ত্বের লোকেরা কালকর্ণীর বুদ্ধির খুব প্রশংসা করল। তাঁর জন্য বোধিসত্ত্বের ধনসম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে — লোকেরা এরূপ বলাবলি করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব গ্রাম থেকে ফিরে এসে সব কথা শুনলেন। তখন তিনি বাড়ির লোকদের ও বন্ধুদের বললেন, তোমরা আমার বন্ধু কালকর্ণীকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলে। যদি তোমাদের কথামতো আমার বন্ধুকে তাড়িয়ে দিতাম তাহলে আজ আমার সব হারাতাম। পথের ভিখারি হয়ে যেতাম। নামের গুণে মানুষ ভালো হয় না, মানুষের আসল গুণ থাকে হৃদয়ে।

তারপর শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব কালকর্ণীর বেতন বাড়িয়ে দিলেন এবং একটি গাথা বললেন। সেই গাথার অর্থ হলো–

কারও সঙ্গে শত পা হাঁটলে তাকে বন্ধু ডাকা যায়। বার দিন একসাথে থাকলে তাঁকে সহায় করে নেওয়া যায়। পনের দিন বা এক মাস একসাথে কাটালে তাঁকে জ্ঞাতির মর্যাদা দেওয়া যায়। তার বেশি দিন একসাথে থাকলে তাঁকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আর কালকর্ণী আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তাকে কি আমি দূরে ঠেলে দিতে পারি ?

উপদেশ : বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

নাম নয়, চরিত্রের গুণাবলিই আসল–ভাবসম্প্রসারণ কর

পাঠ : ৫
শশ জাতক

অতীতকালে বারানসী রাজ্যের রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব শশককুলে জন্মগ্রহণ করে এক বনে বাস করতেন। ঐ বনের একদিকে পর্বত, একদিকে নদী এবং একদিকে গ্রাম। শশকরূপী বোধিসত্ত্বের তিন বন্ধু ছিল। শিয়াল, বানর ও উদ্‌বিড়াল। চার বন্ধু বাস করতো গঙ্গা নদীর তীরে। শশক ছিলেন খুব পণ্ডিত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিন বন্ধুকে 'দান করা উচিত', 'শীল রক্ষা করা উচিত', 'উপোসথ পালন করা উচিত' এরূপ ধর্মোপদেশ দিতেন। বন্ধুরা উপদেশসমূহ গ্রহণ করত। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

একদিন শশক চাঁদ দেখে বুঝলেন, পরদিন পূর্ণিমা। বন্ধুদের বললেন, 'আগামীকাল পূর্ণিমা। তোমরা শীল গ্রহণ করে উপোসথ পালন কর। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান কর। শীলবান ব্যক্তির দান মহাফলদায়ক। কোনো যাচক উপস্থিত হলে তোমরা নিজের খাবারের অংশ হতে তাকে খাবার দেবে।'

উপদেশ শুনে বন্ধুরা খাবারের খোঁজে বের হলো।

শিয়াল এক বাড়িতে ঢুকল। সে দেখল এক হাঁড়ি মাংস, মিষ্টি ও এক ভার দই বারান্দায় পড়ে আছে। সে উচ্চ স্বরে তিনবার হাঁক দিল - এগুলো কার? এগুলো কার? এগুলো কার? কেউ সাড়া দিল না। তখন সে ঐ সব দ্রব্য নিয়ে গর্তে ফিরে এল এবং 'বেলা হলে আহার করব' এরূপ সংকল্প করে শীল ভাবনা করতে থাকল।

ওদিকে উদ্‌বিড়াল সমুদ্রের তীরে গিয়ে মাছের গন্ধ পেল। বালি খুঁড়ে সে চারটি মাছ বের করল। সেও তিনবার বলল- এগুলো কার? এগুলো কার? এগুলো কার? কেউ সাড়া দিল না। তখন সে মাছগুলো গর্তে নিয়ে এল এবং 'বেলা হলে আহার করব' -এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।

বানরও বন থেকে একগুচ্ছ আম পেড়ে নিয়ে এল এবং 'বেলা হলে আহার করব' -এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।

শশকরূপী বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের উপদেশ দিচ্ছেন

এদিকে বোধিসত্ত্ব তৃণ ভক্ষণ করবেন বলে স্থির করলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমার খাবার তো ঘাস। মানুষ ঘাস খায় না। আমার কাছে কোনো যাচক উপস্থিত হলে তাকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করব'।

তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজের শরীরের মাংস আগুনে পুড়িয়ে তা দিয়ে আপ্যায়ন করবেন।

দেবরাজ ইন্দ্র শশকের মহাসংকল্পের কথা জানতে পারলেন। দান পরীক্ষার জন্য ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি একে একে সবার দান গ্রহণ করলেন। অবশেষে শশকের কাছে এলেন। শশক তাঁকে দেখে খুব খুশি। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে বললেন, 'আপনি আহারের জন্য আমার কাছে এসে উত্তম কাজ করেছেন। আমি আপনাকে এমন দান দেব, যা আগে কেউ কখনো দান করেনি। আপনি আগুন জ্বালুন। আমি তাতে ঝাঁপ দেব। আগুনে আমার শরীর সিদ্ধ হলে আপনি সেই মাংস খেয়ে শ্রামণ্য ধর্ম পালন করবেন।'

ইন্দ্র খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালালেন। শশকরূপী বোধিসত্ত্ব তিনবার গা ঝাড়া দিলেন। পোকা-মাকড় থাকলে যাতে শরীর থেকে পড়ে যায়। তারপর নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য আগুন তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করল না। শশক ব্রাহ্মণকে বললেন, ব্রাহ্মণ! তোমার আগুন এত শীতল কেন?

ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে শশক! আমি ইন্দ্র। তোমার দান পরীক্ষার জন্য এরূপ করেছি।
শশক বললেন, হে দেবরাজ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই আমার দান পরীক্ষা করুক। আমাকে কখনো দানবিমুখ দেখবে না।

ইন্দ্র বললেন, 'শশক, তোমার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।' দেবরাজ ইন্দ্র চন্দ্রমহলে একটি শশকচিহ্ন এঁকে দিলেন। সে কারণে আজও আমরা চাঁদে একটি শশকের চিহ্ন দেখি।

উপদেশ : শীলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ
শশকের বন্ধু কারা?

পাঠ : ৬
আম্রজাতক

পুরাকালে বারানসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তার রাজত্বকালে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বয়োঃপ্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্ব ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচশত ভিক্ষু সংগে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে বাস করতেন।

একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সব জলাশয় শুকিয়ে গেল। চারদিকে পানীয় জলের বড় অভাব। তৃষ্ণায় পশুপাখি সব কাতর হয়ে পড়ল। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। পশুপাখিদের এই যন্ত্রণা দেখে এক ভিক্ষুর মায়া হল।

ভিক্ষু একটা গাছ কাটলেন। সেই গাছের ডাল দিয়ে একটা ডোঙ্গা তৈরি করলেন। ডোঙ্গাটি জলপূর্ণ করে তিনি পশুপাখিদের জলপান করার ব্যবস্থা করে দিলেন। বনের সব পশুপাখি এসে সেই ডোঙ্গা থেকে জলপান করতে লাগল। এতে অসংখ্য জীবের প্রাণ রক্ষা পেল।

প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী জলপান করতে আসতে লাগল। ফলে ভিক্ষু আহারের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করার সময় পেতেন না। ভিক্ষু তার নিজের আহারের কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত প্রাণীদের তৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন। এটা দেখে পশু পাখিরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের তৃষ্ণা মেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ভিক্ষু অনাহারে থেকে কষ্ট ভোগ করছেন। তারা ঠিক করল এবার থেকে যে প্রাণী যখন জলপান করতে আসবে তখন তার সাধ্য অনুসারে ভিক্ষুর জন্য কিছু ফল নিয়ে আসবে।

প্রাণীরা জল পান করছে

এরপর থেকে প্রত্যেক পশুপাখি নিজের সাধ্যমতো আম, জাম, কাঁঠাল, মধুর, অমধুর প্রভৃতি ফল নিয়ে জলপান করতে আসতে লাগল। এভাবে প্রতিদিন এত ফল আসতে লাগল যে, আশ্রমের পাঁচশ ভিক্ষুও খেয়ে শেষ করতে পারতেন না।

সৎ কাজে ভিক্ষুটির এই আত্মোৎসর্গ দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, "দেখ, সৎকাজের কী অদ্ভুত মহিমা! একজনের ব্রতের ফল কতজন ভিক্ষু ভোগ করছে। তাদের কাউকে আর ফল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কষ্ট করে বনে যেতে হচ্ছে না।"

উপদেশ : কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ
ভিক্ষু কেন প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করেছিলেন?

পাঠ : ৭

মশক জাতক

পুরাকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করে জীবনধারণ করতেন। তখন কাশী রাজ্যের এক গ্রামে অনেক সূত্রধর বাস করত। তারা কাঠ দিয়ে নানা রকম আসবাবপত্র তৈরি করত। সেখানে একদিন এক বৃদ্ধ সূত্রধর কাঠ কেটে আসবাবপত্র তৈরির কাজ করছিল। পাশে তার পুত্র বসে ছিল। এমন সময় এক মশক তার মাথায় বসে চুঁচালো হুল ফুটিয়ে দিল। সে পুত্রকে ডেকে বলল, 'বৎস, আমার মাথায় মশক হুল ফুটিয়ে রক্ত পান করছে। তুমি মশকটি তাড়িয়ে দাও।' পুত্র বলল, 'বাবা, আপনি স্থির থাকুন। আমি এক আঘাতেই মশকটি মেরে ফেলব।' ঐ সময় বোধিসত্ত্ব পণ্যসম্ভার নিয়ে বৃদ্ধ সূত্রধরের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন। তিনি বাড়ির সামনে বসলেন। তিনি বসলে সূত্রধর আবার বলল, 'বৎস, মশকটি তাড়িয়ে দাও।' তখন তার ছেলে 'তাড়াচ্ছি' বলে এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণ ধার কুঠার উত্তোলন করল এবং পিতার পেছন দিক থেকে 'মশা মারি', 'মশা মারি' বলতে বলতে বৃদ্ধের মাথায় জোরে আঘাত করলো। সাথে সাথে বৃদ্ধের মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল এবং বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

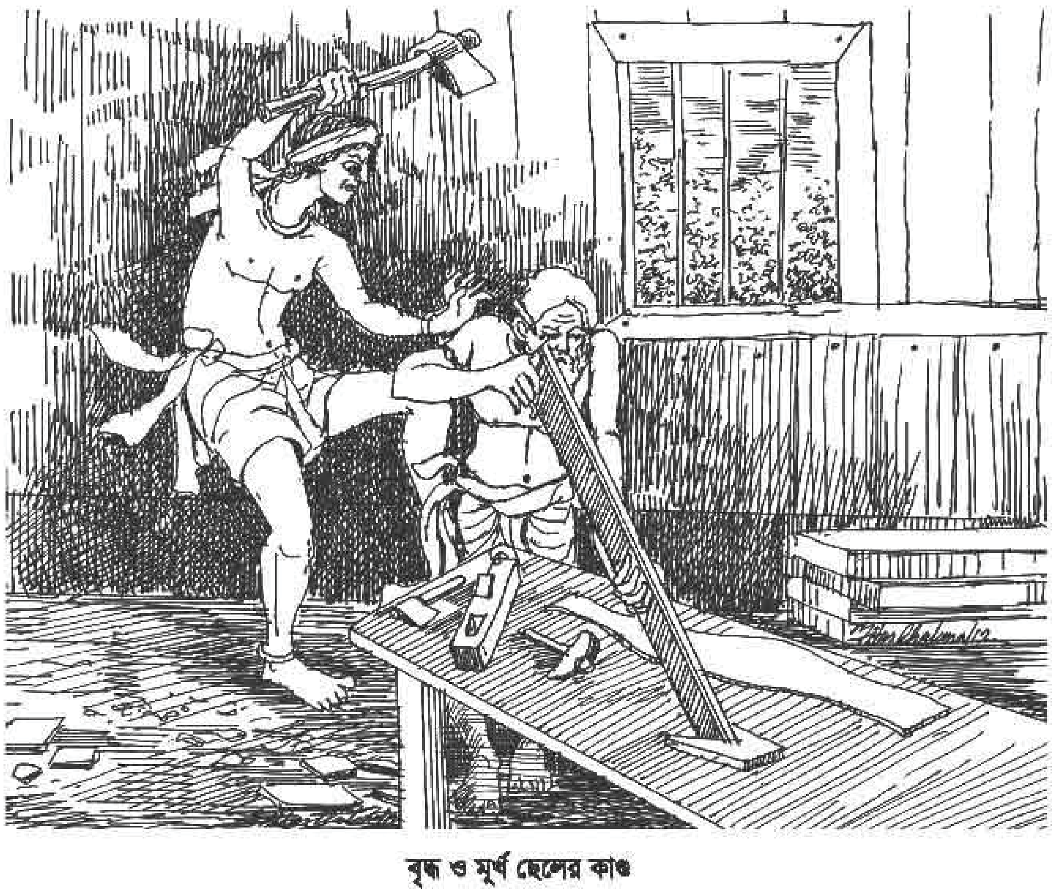

বৃদ্ধ ও মূর্খ ছেলের কাণ্ড

বোধিসত্ত্ব এই কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এত নির্বোধ লোক কোথাও দেখিনি। এরূপ মূর্খের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও অনেক ভালো। কারণ যিনি বুদ্ধিমান তিনি শাস্তির ভয়ে মানুষ হত্যা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ছেলেটি এতই মূর্খ যে মশা মারতে গিয়ে নিজের বাবাকে মেরে ফেলল।

মূর্খ ছেলের এই কাজ দেখে বোধিসত্ত্ব একটি গাথা আবৃত্তি করে সে স্থান ত্যাগ করলেন। গাথাটি হলো :

বুদ্ধিমান শত্রু সেও মোর ভালো
নির্বোধ মিত্রে কী কাজ?
মশক মারিতে বধিল পিতারে
মহামূর্খ পুত্র আজ।

উপদেশ : মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।

অনুশীলনমূলক কাজ
সূত্রধর কী কাজ করছিল?

পাঠ : ৮

জাতকের উপদেশসমূহ অনুসরণের নির্দেশনা

'জাতক' হলো গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। কিন্তু জাতকগুলোতে অনুসরণীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ পাওয়া যায়। এসব উপদেশ মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির উৎকর্ষসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এসব উপদেশ অনুসরণ করা একান্ত উচিত। নিচে জাতকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় উপদেশ তুলে ধরা হলো। যেমন : কপোত জাতক পাঠে আমরা লোভের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ শিক্ষা মতে, অতিরিক্ত লোভ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। তাই সকলের লোভ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এভাবে শশ জাতকে শীল পালনের উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ জাতকের উপদেশ মতে, শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। আম্র জাতক কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্যমশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। কালকর্ণী জাতকে বিপদের দিনে কীভাবে বন্ধুর উপকার করতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ রয়েছে। মশক ও রোহিনী জাতকে মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো বলে নির্দেশনা রয়েছে।

জাতকগুলোতে এরূপ অনেক উপদেশ পাওয়া যায়, যা নির্বুদ্ধিতা, কৃপণতা, অলসতা, অহংবোধ, ধূর্ততা, ইত্যাদি বর্জনের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া এসব উপদেশ আমাদেরকে অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম সম্পাদনের প্রেরণা যোগায়। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। তাই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে জাতকের উপদেশ অনুসরণ অপরিহার্য।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. এক জন্মের .... কেউ বুদ্ধ হতে পারে না।

২. যন্ত্রণায় কাক .... করতে লাগল।

৩. একদিন শশক .... দেখে বুঝল পরদিন পূর্ণিমা।

৪. একবার হিমালয়ে ভয়ানক .... দেখা দিল।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে	মাছের গন্ধ পেল
২. জাতকের কাহিনীগুলো	ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল
৩. বারানসীর লোকেরা পুণ্য কামনায়	কুশলকর্ম সম্পাদন করতেন
৪. পাচক সঙ্গে সঙ্গে	ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো বুঝতে সাহায্য করে
৫. উদ্‌বিড়াল সমুদ্রের তীরে গিয়ে	পাখিদের সেবা করতেন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জাতকের সংখ্যা কত?

২. ভিক্ষু কীভাবে প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করলেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩. শশক তাঁর বন্ধুদের কী ধর্মোপদেশ দিতেন?

৪. মশকটি বৃদ্ধের মাথায় কী করছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'জাতক' কাকে বলে? জাতকের পরিচিতি বিস্তারিত আলোচনা কর।

২. কালকর্ণী জাতকের উপদেশ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩. মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু কেন ভালো? ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পায়রারূপী বোধিসত্ত্বের অনুচর হিসেবে কে থাকত?

ক. মশক খ. কাক

গ. বানর ঘ. শশক

২. উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা না শুনলে হয়-

i. বিপদ অবশ্যম্ভাবী

ii. মৃত্যু অনিবার্য

iii. সম্পর্ক বিচ্ছেদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তরুণ চাকমা পেশায় রাজমিস্ত্রী। কিন্তু যথেষ্ট চতুর। তার ছেলে বিমল চাকমা একেবারে অকর্মণ্য ও বোকা। যার কারণে মাঝে মধ্যে মারাত্মক সমস্যা হয়।

৩. তরুণ চাকমার চরিত্রের সাথে কোন জাতকের মিল রয়েছে?

ক. কপোত জাতক খ. আম্র জাতক

গ. মশক জাতক ঘ. শশ জাতক

৪. বিমলের আচরণে কোন দিকটি প্রকাশ পায়?

ক. নির্বোধের খ. সরলতার

গ. অজ্ঞতার ঘ. হেঁয়ালিপনার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একদা নোয়াখালীর নিচু জায়গায় অতিবৃষ্টির কারণে নলকূপগুলো ডুবে যায়। এতে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। উক্ত এলাকায় দুরবস্থার খবর পত্রিকায় দেখে মানিক বড়ুয়ার মায়া হয়। তাই তিনি তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এতে এলাকাবাসী উপকৃত হয়।

ক. চার বন্ধু কোথায় বাস করত?

খ. অনৈতিক কাজ করা উচিত নয় কেন?

গ. মানিক বড়ুয়ার সাথে জাতকের কার চরিত্রের মিল পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত"— এ উপদেশটির সঙ্গে মানিক বড়ুয়ার কাজটি কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

২. এক বুড়িমার নাতির পুতুল কেনার শখ হলো। তাই সে ঠাকুরমার কাছে বায়না ধরে। কিন্তু বুড়িমা সম্বলহীন হওয়ায় নাতির ইচ্ছা পূরণে বাসার পুরনো এক থালা বদল করে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে পুতুল কিনতে চায়। ফেরিওয়ালা থালাটি সোনার বুঝতে পেরে ছলনা করে থালার মূল্য অনেক কম বলে পুতুল দিতে রাজী হয়নি। কিন্তু বুড়ি অন্য এক ফেরিওয়ালার নিকট বেশি দামে থালাটি বিক্রয় করে পুতুল কিনে। পরে প্রথম ফেরিওয়ালা এসে তা শুনে হায় হায় করতে করতে মৃত্যুবরণ করল।

ক. জাতক শব্দের অর্থ কী?

খ. জাতক পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গল্পটি কোন জাতকের সাথে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. লোভী ফেরিওয়ালার আচরণের ফলাফল তোমার পাঠ্যবইয়ের জাতকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান

বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের অনেক ধ্বংসস্তূপ আছে। খননকার্যের ফলে এসব ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাচীন বিহারের অবকাঠামো, বুদ্ধ ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূল্যবান মূর্তি, ব্যবহারিক দ্রব্য, মুদ্রা, শিলালিপি, কারুকার্যময় পোড়ামাটির ফলকচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের অনেক কীর্তি জড়িত আছে। বাংলাদেশ সরকার এসব ধ্বংসস্তূপ ও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করছে। এছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধমূর্তি ও চৈত্য আছে। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক এগুলো দেখতে আসে। তাই এগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় স্থান হিসেবে খ্যাত। এগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস। এসব স্থান বৌদ্ধদের নিকট খুবই পবিত্র এবং প্রিয়। এগুলো দর্শন করলে মনের প্রসারতা বাড়ে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিতে পারব।
* বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান পরিচিতি

বাংলাদেশে প্রচুর বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান আছে। এগুলোর মধ্যে বিহার, চৈত্য, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দেব-দেবীর মূর্তি, স্তূপ, প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও নগরের ধ্বংসাবশেষ, ব্যবহার্য দ্রব্য, পোড়ামাটির ফলক, চিত্র, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসবের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

খননকার্যের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লার ময়নামতিতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহার ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, রূপবান বিহার, ইটাখোলা বিহার, কুটিল্যা মুড়া, কোটবাড়ি মুড়া, চারপত্র মুড়া, ত্রিরত্নমুড়া উল্লেখযোগ্য। বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মহাস্থানগড়, ভাসু বিহার, গোবিন্দ ভিটা, বৈরাগীর ভিটা অন্যতম। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের আবিষ্কৃত সর্ববৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। এছাড়া এ অঞ্চলে হলুদ বিহার, জগদ্দল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। দিনাজপুরে সীতাকোট বিহারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সম্প্রতি নরসিংদী জেলায় উয়ারী বটেশ্বর, পঞ্চগড় ও মুন্সিগঞ্জ জেলায়ও প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো আমাদের অতীত ঐতিহ্যের স্মারক। বাংলাদেশ সরকার এগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করছে। এসব বৌদ্ধ ঐতিহ্য দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের সমাগম হয়।

আধুনিককালে নির্মিত অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধমূর্তি আছে, যেগুলো বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে পাহাড়তলীর মহামুনি বিহার, রাউজানের সুদর্শন বিহার,

বাগোয়ানের ফরাচিন বিহার, পটিয়ার সেবাসদন বিহার, ঠেগরপুনির বুড়া গোঁসাই বিহার, চক্রশালা বিহার, রামুর রামকোট বিহার, কক্সবাজারের অগ্গমেধা বিহার, রাঙ্গামাটির চিৎমরম বিহার, সীতাকুন্ডের সজ্ঝারাম বিহার, রাঙামাটি রাজবন বিহার, খাগড়াছড়ির পানছড়িতে অবস্থিত অরণ্য কুটির বিহার, ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবানের স্বর্ণ মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এসব বিহারে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য স্থাপনার নির্মাণশৈলী খুবই চমৎকার। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী বিহারের দেয়ালে অঙ্কিত আছে, যা আকর্ষণীয় এবং দর্শনার্থীর মনে ধর্মভাব জাগ্রত করে। দেড় শত বছর আগে ঠেগরপুনি গ্রামের পুকুরে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি পুকুর থেকে উদ্ধার করার জন্য হারাধন বড়ুয়ার স্ত্রী নীলমনি বড়ুয়া স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হন। তাঁর স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটি অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে জানা যায়। এই মূর্তির নিকট যদি কেউ কুশলচিত্তে কোনো কিছু প্রার্থনা করে তার সেই মনোবাসনা পূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে চিৎমরমের বুদ্ধমূর্তি, মহামুনি বুদ্ধমূর্তি, বাগোয়ানের ফরাচিন মূর্তিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে। তাই অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ যে কোনো শুভকাজ আরম্ভ করার আগে এসব বিহারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিহারগুলো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। এসব বিহারপ্রাঙ্গণে বিভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে মেলা ও উৎসবের আয়োজন হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এসব স্থানে বহু পর্যটকের সমাগম হয়। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বৌদ্ধ বিহার, চৈত্য ও বুদ্ধমূর্তি আছে, যেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর।

অনুশীলনমূলক কাজ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহের তালিকা তৈরি কর (দলীয় কাজ)

আধুনিক কালের দশটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারের নাম লেখ

পাঠ : ২
ময়নামতি

কুমিল্লা জেলার কেন্দ্রস্থল থেকে আট মাইল দূরে ময়নামতি অবস্থিত। ময়নামতি ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এবং প্রায় এগার মাইল বিস্মৃত। এই পাহাড়গুলো অতীতে বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। খননকার্যের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে এ সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। সে সময় এগুলো ঢিবি আকারে ছিল। স্থানীয় লোকেরা এসব ঢিবি থেকে ইট সংগ্রহ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কুমিল্লা বিমানবন্দর তৈরির সময় ঠিকাদাররাও এসব ঢিবি থেকে ইট সংগ্রহ করত। ফলে অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তু নষ্ট ও হারিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সরকার ২০টি নিদর্শনকে প্রাচীনকীর্তি রক্ষা আইনে সংরক্ষিত করেছে। তার মধ্যে ময়নামতি অন্যতম। এখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে খননকাজ চালানো হয়। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, বুদ্ধমূর্তি, স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা, মৃৎফলক, আসবাবপত্র এবং শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এখানে খড়গবংশ, চন্দ্রবংশ, দেববংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করতেন। এ অঞ্চল বৌদ্ধ পাল রাজারাও শাসন করতেন। এই বৌদ্ধ রাজবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়নামতি অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ বিহার গড়ে ওঠে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ময়নামতি ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যাচর্চার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে বিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতে আসতেন।

এ অঞ্চলে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মধ্যে শালবন বিহার ছিল সবচেয়ে বড়। নিচে শালবন বিহারের বর্ণনা দেওয়া হলো।

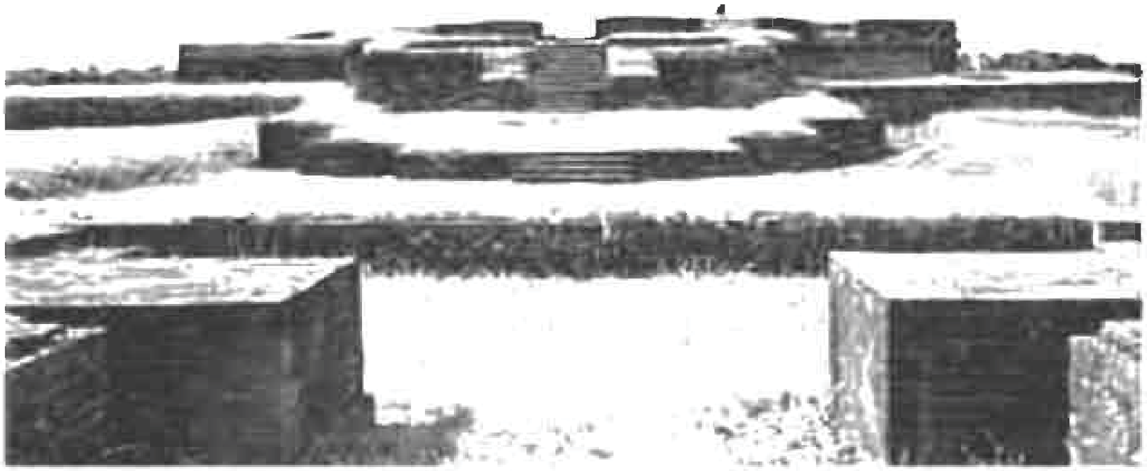

শালবন বিহার

শালবন বিহার

শালবন বিহারের ধ্বংসস্তূপে একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। সেই তাম্রলিপি হতে জানা যায় যে, শালবন বিহারটি রাজা ভবদেব নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দেববংশের রাজা আনন্দদেবের পুত্র। অষ্টম শতাব্দীর দিকে দেববংশ এ অঞ্চল শাসন করতেন। খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত বিহারের ধ্বংসাবশেষ হতে বোঝা যায়, বিহারটি ছিল বর্গাকৃতির। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট। বিহারের চারদিক দেয়ালবেষ্টিত। দেয়ালের উচ্চতা সাড়ে ১৬ ফুট। এই বিহারে ১১৫টি কক্ষ ছিল। সব কক্ষই সমান। কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন। একটি কক্ষ থেকে অপর কক্ষ ৫ ফুট পুরু দেয়াল দিয়ে পৃথক করা। উত্তর দিকে একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিল। মন্দিরে প্রবেশের সিঁড়িও উত্তর দিকে ছিল। মূল মন্দিরটি ক্রুশ আকৃতির। এটি ইট নির্মিত এবং বিহার অঙ্গনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি আয়তাকার। দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট, প্রস্থে ১১০ ফুট। মন্দিরকে বেষ্টন করে ৭ ফুট চওড়া প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। মন্দির গাত্রের দেয়াল সারি সারি পোড়া মাটির ফলক চিত্রে অলঙ্কৃত ছিল।

বিহারাঙ্গনে আরো অনেক স্থাপত্যের নিদর্শন আছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্তম্ভবিশিষ্ট একটি হলঘর আছে। কেন্দ্রীয় মন্দিরের পশ্চিমে দুটি ছোট মন্দির আছে। বিহারের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ৬০ ফুট দূরে বর্গাকৃতির একটি চার কোণাকার মন্দির আছে। পূজাকক্ষ মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

খননের ফলে এখানে বহু প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ৮টি তাম্রলিপি, স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা, অলংকার, ব্রোঞ্জের বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নানা দেব-দেবীর মূর্তি, অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কৃত ইট, প্রস্তরমূর্তি, তামার পাত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলো খুবই সুন্দর এবং মূল্যবান।

শালবন বিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এই বিহারে শিক্ষা দেয়া হতো। বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ বিহারের খুব সুখ্যাতি ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতেন। দেববংশ, চন্দ্রবংশ এবং পালবংশের রাজারাও এই বিহারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিহারটি চার শত বছর টিকে ছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

ময়নামতি কোথায় অবস্থিত?

ময়নামতিতে কখন বৌদ্ধ নিদর্শনগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল?

শালবন বিহারে যেসব জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর

শালবন বিহারের একটি চিত্র অঙ্কন কর

পাঠ : ৩

পাহাড়পুর

নওগাঁ জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে পাহাড়পুর অবস্থিত। পালবংশের রাজারা এই অঞ্চলটি শাসন করতেন। এ অঞ্চলটি বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। পালবংশের রাজা ধর্মপাল এখানে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটির নাম 'সোমপুর বিহার।' এটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারের জন্য পাহাড়পুরের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিচে সোমপুর বিহারের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

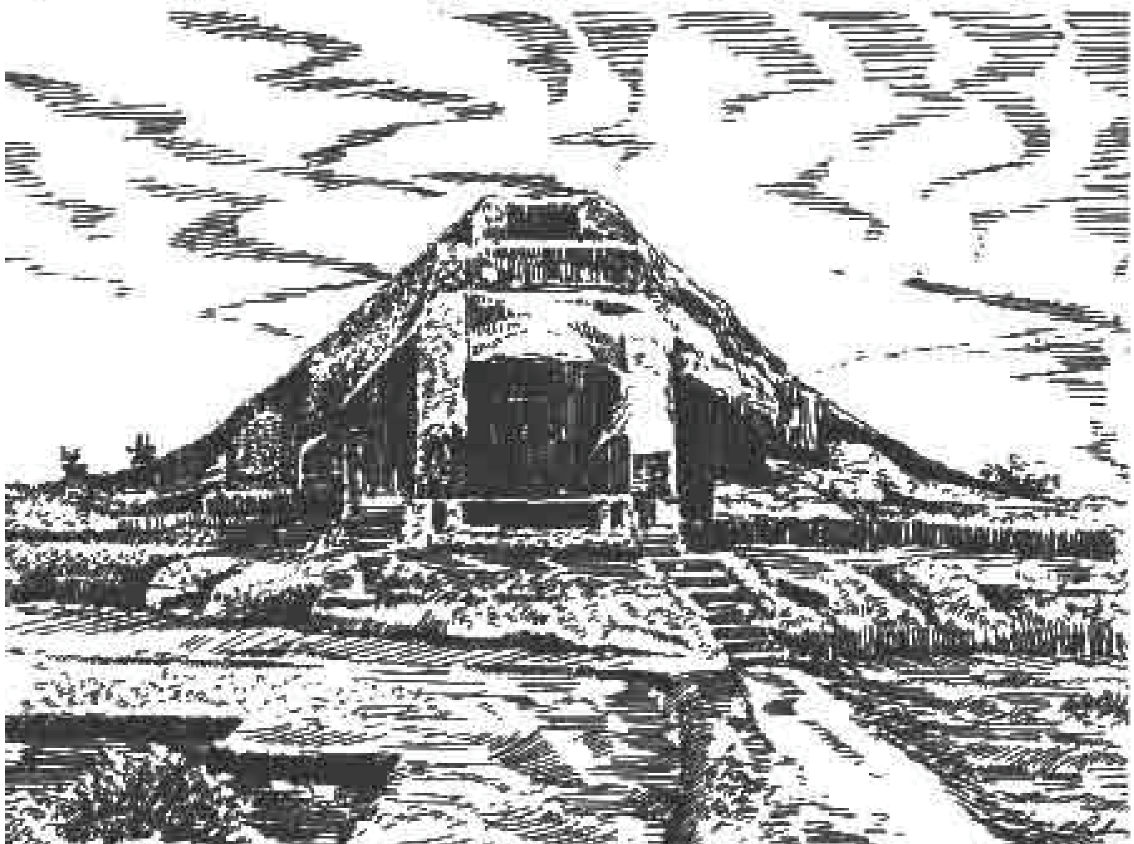

সোমপুর বিহার

সোমপুর বিহার

খননকার্যের ফলে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। বিহারটি বর্গাকৃতির। প্রায় ২৭ একর জমি জুড়ে বিহারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। বিহারের চারদিক প্রকাণ্ড ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বিশাল বিহারটি দুর্গের মতো দেখায়। এতে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য ১৭৭টি কক্ষ ছিল। কক্ষগুলোতে কোনো জানালা ছিল না। তবে দেয়ালের মধ্যে কুলুঙ্গি ছিল। সব কটি কক্ষ একই মাপের (১৪ × ১৩ ফুট)। প্রত্যেক কক্ষে একটি প্রবেশপথ রয়েছে। বিহারাঙ্গনে অসংখ্য নিবেদন স্তূপ, ছোট ছোট মন্দির, পুষ্করিণী এবং অন্যান্য স্থাপনা ছড়িয়ে আছে। বিহারের কেন্দ্রস্থলে ক্রুশ আকৃতির সুউচ্চ একটি মন্দির আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এর ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হয়েছে।

বিহারের প্রধান প্রবেশপথ উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রবেশপথ ছিল বেশ বিস্তৃত। বিহারের দেয়ালগাত্র অপূর্ব পোড়ামাটির ফলক চিত্রে অলঙ্কৃত ছিল। সহজ-সরল গ্রামীণ শিল্পীরা মাটি দিয়ে এগুলো তৈরি করেছিল। এগুলো ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ চিত্র। এগুলোর শিল্পমান অনন্য সাধারণ।

রাজা ধর্মপাল এ বিহারকে কেন্দ্র করে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে খননকার্যের ফলে বহু বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্র নির্মিত দ্রব্য, আসবাবপত্র আবিষ্কৃত হয়। খলিফা হারুন-অর-রশিদের আমলের মুদ্রাও আবিস্কৃত হয়েছে। এতে মনে হয়, পাল আমলে এদেশের সঙ্গে আরব দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করেন। পরে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত গিয়ে ধর্ম প্রচার এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এটি শুধু বৌদ্ধ বিহারই ছিল না, বিদ্যাপীঠও ছিল। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। দেশি-বিদেশি পণ্ডিতগণ এই বিহারে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসতেন। বহির্বিশ্বেও এ বিহারের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউনেস্কো পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারকে ‘বিশ্ব ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

সোমপুর বিহার অঙ্গনে অবস্থিত স্থাপনাগুলোর তালিকা তৈরি কর (দলীয় কাজ)

সোমপুর বিহারে প্রাপ্ত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত কর

পাঠ : ৪

রামকোট বিহার

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় রামকোট বিহার অবস্থিত। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার প্রধান সড়কের প্রায় দু'মাইল পূর্বে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা বিহারটি দেখতে খুবই সুন্দর। বিহারের ফটকে 'রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার' লেখা রয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে এটিকে সবাই রামকোট বনাশ্রম নামেই জানে।

রামকোট বিহারের প্রবেশপথ

সতেরটি ছোটবড় পাহাড় দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বিহারটি পরিবেষ্টিত। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে চারদিকে ছড়ানো বহু প্রাচীন ইটের টুকরো, বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। বিহারটির চূড়ার উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। এই অসাধারণ নির্মাণকাজের জন্য বিহারটি অন্যতম বৌদ্ধ নিদর্শন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

রামকোট বিহারের দক্ষিণ পাশের অন্য একটি ছোট পাহাড়ের স্তূপ থেকে একটি মূল্যবান শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। সেটি তস্করদল লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। স্থানীয় জনসাধারণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই মূল্যবান শিলালিপিটি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। স্তূপটিও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। জানা যায়, ১৯৩০ সালে জগৎচন্দ্র মহাস্থবির নামে এক মিয়ানমার (আগের বার্মা) ভিক্ষু শ্রীলংকায় একখানি শিলালিপি উদ্ধার করেন। সেই শিলালিপির বর্ণনা মতে এখানে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালানো হয়েছিল। খননকাজের ফলে বৃহৎ দালানবাড়ির ধ্বংসাবশেষ ও পাথরে নির্মিত সুদৃশ্য সুদর্শনের অবয়বযুক্ত প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিটি এখনো রামকোট বিহারে সংরক্ষিত আছে। বিহারের চারপাশে প্রচুর পরিমাণ স্থানীয় বেলে পাথরে নির্মিত ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তিটি অন্যতম।

বিহারটির দক্ষিণ-পূর্বদিকে সবচেয়ে মূল্যবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। এ প্রত্নস্থলের কেন্দ্রস্থলটি আনুমানিক ৩০ ফুট উঁচু একটি টিলার ওপর অবস্থিত। গঠন প্রণালি বিবেচনা করে এটি একটি বিশাল সঙ্ঘারাম ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই বিহারটি চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকান রাজ্যের সম্পর্ক ও সংস্কৃতি বিনিময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

বর্তমানে বিহারটিতে 'অরিয়ধর্ম' নামে একটি পাঠাগার আছে। গ্রন্থসংখ্যা ছয়শতের অধিক। পাঠাগারটি সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত।

এ প্রাচীন এই ধ্বংসাবশেষ একটি রম্যবতী নগরী ও বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যময় গৌরব গাথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থানীয় ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ বিহারস্থ ভিক্ষু ও শ্রমণদের ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেন। বিহারে অবস্থিত বৃহৎ বুদ্ধমূর্তিটি দর্শন করার জন্য দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক এখানে আসেন। খননকার্য চালানো হলে এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

রামকোট বিহার কোথায় অবস্থিত?

রামকোট বিহারের গঠনশৈলী বর্ণনা কর

পাঠ : ৫

রাজবন বিহার

১৯৭৪ সালে রাঙামাটি শহরে রাজবন বিহার স্থাপিত হয়। বিহারটি অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। বিহারের মনোরম এলাকায় পশুপাখি নির্ভয়ে বিচরণ ও চলাচল করে। শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। গভীর অরণ্যে ভাবনা করার জন্য তিনি "বনভন্তে" নামেই অধিক পরিচিত। বাংলাদেশি বৌদ্ধরা তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে তাঁর অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি চাকমা রাজপরিবার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে ১৯৭৪ সালে রাঙামাটি জেলার লংগদু থেকে এই বিহারে আগমন করেন। রাজপরিবার কর্তৃক দানকৃত জমিসহ রাজবন বিহারের মোট আয়তন ৪৭ একর। বিহারে উপাসনা মন্দির, চৈত্য, ভিক্ষুশালা, দেশনাঘর, চংক্রমণ কুটির, ভিক্ষুসীমা, ভোজনালয়, পাঠাগার, যাদুঘর, বয়নশালা, ভিক্ষু উপগুপ্তের মূর্তি, সপ্তস্বর্গের প্রতীক, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতি রয়েছে। বিহারটির নির্মাণশৈলী অপূর্ব।

রাজবন বিহার

পার্বত্যাঞ্চলে বনবিহারের ষাটের অধিক শাখা আছে এবং বনভন্তের শিষ্য-প্রশিষ্যের সংখ্যা সহস্রাধিক। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ধূতাঙ্গশীল পালন করেন। বৌদ্ধদের নিকট এই বিহারটি তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত। এই তীর্থস্থানে প্রতিদিন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে জনগণ এই বিহারে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করতে আসেন। এছাড়া দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এ বিহারে সন্তানের অন্নপ্রাশন, সঙ্ঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, চীবর দান প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান করতে আসেন।

এই বিহারে পূর্ণিমা তিথিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণভাবে বুদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান এবং বনভন্তের জন্মদিন পালন করা হয়। কঠিন চীবর দানের সময় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা কেটে, রং করে, কোমরতাতে বুনে, সেলাই করে চীবর তৈরি করা হয়। এই দৃশ্য খুবই চমৎকার। চাকমা রাজমাতা বা চাকমা রানি দিনের শুরুতে সুতা কাটা উদ্বোধন করেন এবং দিনের শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেশনা প্রদানের পর চাকমা রাজা চীবর দান করেন। এদিন প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন বিহারটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বনভন্তে এবং রাজবন বিহারের খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক এবং ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণ রাজবন বিহার দর্শন করতে আসেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে এই বিহারের আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজবন বিহার অঙ্গনে অবস্থিত স্থাপনাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর

কঠিন চীবর দানের সময় রাজবন বিহারে কীভাবে চীবর তৈরি করা হয় তা বর্ণনা কর

পাঠ ঃ ৬

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল ও সংরক্ষণের উপায়

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল অনেক। দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করলে ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মন উদার হয়। দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুভূতির বিকাশ ঘটে। দেশের সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষায় প্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই সময় পেলে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন এবং শিক্ষকের সঙ্গে দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণ করা উচিত।

দর্শনীয় স্থানসমূহ জাতীয় সম্পদ। এগুলো দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরে। পর্যটন শিল্প হিসেবে রাজস্ব আয় করে। তাই দর্শনীয় স্থানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

বিভিন্ন কারণে দর্শনীয় স্থানসমূহ ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। নদীভাঙন, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি, তুফান, পশু-পাখির মল ত্যাগ, কীটপতঙ্গের উপদ্রব, অপ্রয়োজনীয় লতা-পাতা, গাছ-পালা জন্মে বা উদ্ভিদজাত সংক্রমণ, বায়ুদূষণ, অজ্ঞ মানুষের অহেতুক কৌতূহল, লুটেরাদের দৌরাত্ম্য, যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কারণে দর্শনীয় স্থানগুলো ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। তাই ওপরে বর্ণিত কারণে যাতে দর্শনীয় স্থানগুলোর ক্ষতি না হয় সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে। দর্শনীয় স্থানের চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘের দিতে হবে। পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শ্রদ্ধাসহকারে যত্ন নিতে হবে। সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এগুলো জাতীয় সম্পদ। জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব। তাই দর্শনীয় স্থানগুলো সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফলগুলো লেখ

দর্শনীয় স্থান ধ্বংসের কারণগুলো লিপিবদ্ধ কর

দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা কর

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বাংলাদেশে প্রচুর বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও ----------স্থান আছে।

২. বিহারগুলো মনোরম--------পরিবেশে অবস্থিত ।

৩. শালবন বিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার ---------- ।

৪. কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় ------------বিহার অবস্থিত।

৫. ---------- সালে রাঙামাটি শহরে রাজবন বিহার স্থাপিত হয়।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে	পোড়ামাটির ফলকচিত্রে অলঙ্কৃত ছিল
২. বিহারের দেয়ালগাত্র অপূর্ব	এখানে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন
৩. পাল বংশের রাজা ধর্মপাল	আমলের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে
৪. খলিফা হারুন-অর-রশিদের	চাকমা রাজা চীবর দান করেন
৫. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেশনা প্রদানের পর	সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারগুলোর নাম লিখ।

২. সোমপুর বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. শালবন বিহারে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি ও ধ্বংসাবশেষ থেকে কী কী ধারণা পাওয়া যায়? আলোচনা কর।

৪. রামকোট বিহারের শিলালিপি সম্পর্কে ধারণা দাও।

৫. রাজবন বিহারে কী কী অনুষ্ঠান পালন করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শনীয় স্থান হিসেবে ময়নামতি সম্পর্কে যা জান লিখ।

২. কঠিন চীবর দান কী? একটি কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

৩. পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ কী? আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সোমপুর বিহারে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য কয়টি কক্ষ ছিল?

ক. ১১০ খ. ১১৫

গ. ১৬৮ ঘ. ১৭৭

২. ময়নামতি বিখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ কোনটি?

ক. বৌদ্ধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায়

খ. শালবন বিহারের সৌন্দর্যের জন্য

গ. তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিতির জন্য

ঘ. ধর্মীয় চর্চার কেন্দ্রের জন্য

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কল্যাণমিত্র চৌধুরী পার্বত্যাঞ্চলের একটি বিহার দর্শনের জন্য যান। বিহারটির নির্মাণশৈলী তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি আরও মুগ্ধ হন উক্ত বিহারের পাঠাগার, বোধিবৃক্ষ, বয়নশালা ও উপাসনালয় দর্শন করে। তিনি আরও জানতে পারেন উক্ত বিহারটি বৌদ্ধদের নিকট পুণ্যতীর্থ হিসেবে পরিচিত।

৩. কল্যাণমিত্র চৌধুরীর দর্শনীয় বিহারটি কোন বিহারের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আনন্দ বিহার খ. মৈত্রী বিহার

গ. রাজবন বিহার ঘ. রাজবিহার

৪. বৌদ্ধধর্মে উক্ত বিহারের গুরুত্ব রয়েছে—

i. দেশে-বিদেশে সুখ্যাতির কারণে

ii. প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থাকার কারণে

iii. অন্যতম তীর্থস্থান হওয়ার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জ্ঞানাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের উপাসক-উপাসিকারা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধস্থান দর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তক্রমে তাঁরা নির্ধারিত সময়ে একটি বিহার দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পৌঁছে বিহারটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তাঁরা আরো লক্ষ করেন বিহারটিতে ১১৫টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষ পুরু দেয়ালে পৃথক রয়েছে। এছাড়া বিহারের মন্দিরের গাত্রের দেয়াল সারি সারি পোড়া মাটির চিত্রে অলঙ্কৃত। উক্ত বিহার দর্শন করে সবাই মুগ্ধ হলেন।

ক. পাল বংশের কোন রাজা সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন?

খ. দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণ করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাসক-উপাসিকারা কোন ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করেছেন? বর্ণনা কর।

ঘ. 'দর্শনীয় স্থানটি বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে'—পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ঘটনা-১

২. দিলীপ মুৎসুদ্দী স্বদেশে ফিরে এসে রাঙামাটি বৌদ্ধ বিহারে অষ্টপরিষ্কার দান করার ইচ্ছে পোষণ করেন। তিনি বিহারে উপস্থিত হয়ে যথাসময়ে দানকার্য সম্পাদন করনে। তিনি ঘুরে ঘুরে উক্ত বিহারে বয়নশালা, ভোজনালয়, ভিক্ষু উপগুপ্তের মূর্তি, সপ্ত স্বর্গের প্রতীক, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি দর্শন করেন।

ঘটনা-২

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিতায়ন চাকমা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যান। তাঁরা কক্সবাজার প্রধান সড়কের প্রায় দু'মাইল পূর্বে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত একটি বিহারে যান। উক্ত বিহারটি সতেরটি ছোট-বড় পাহাড় দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেষ্টিত।

ক. পাহাড়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?

খ. দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

গ. ঘটনা-১ -এর সাথে কোন বিহারটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ রামকোট বিহারের প্রতিচ্ছবি বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিম্বিসার

বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের সময়কালে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছোট ছোট ষোলটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজ্যের রাজারা ছিলেন অনেক ক্ষমতাধর। রাজার ইচ্ছাতেই রাজ্যের সব কাজ পরিচালিত হতো। এ রাজাদের অনেকের সাথে গৌতম বুদ্ধের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। এ সময় অনেক রাজা বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ গ্রহণ করে রাজ্যে অপ্রয়োজনে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি পূজার নামে বা যজ্ঞের নামেও পশুহত্যা অনেক রাজ্যে নিষিদ্ধ ছিল। জনকল্যাণে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে বুদ্ধ রাজাদের উপদেশ দিতেন। অনেক রাজা বুদ্ধের গৃহী শিষ্য বা উপাসক ছিলেন।

এ রাজাদের অনেকেই গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি রাজন্যবর্গের অবদান নামে স্বীকৃত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মগধের রাজা বিম্বিসার। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণযোগ্য। এ অধ্যায়ে আমরা রাজা বিম্বিসার সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* রাজা বিম্বিসারের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
* বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজা বিম্বিসারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
* রাজা বিম্বিসারের জীবনী পাঠ করে পরমত সহিষ্ণুতা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

রাজা বিম্বিসার

বিম্বিসার ছিলেন মগধ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা। গৌতম বুদ্ধের সময়ে যে ষোলটি জনপদ বা রাজ্যের কথা জানা যায় তার মধ্যে মগধ খুবই শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বর্তমানকালের ভারতের বিহার রাজ্যই ছিল মগধ রাজ্য। এই রাজ্যের মাটি উর্বর ছিল এবং প্রচুর ফসল হতো। এ রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিরণ্যবতী বা শোন নদী।

বিম্বিসার ছিলেন হর্যঙ্ক বংশের খ্যাতিমান নৃপতি। তাঁর নামের সাথে 'শেণিয়' বা 'শ্রেণিক' বিশেষণ যুক্ত হয়ে তিনি 'মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার' নামে খ্যাত ছিলেন। এটি ছিল তাঁর বংশের উপাধিবিশেষ। রাজা বিম্বিসারের রাজ্যাভিষেকের সঠিক সময় জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে, গৌতমবুদ্ধের পরিনির্বাণের আনুমানিক ষাট বছর আগে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বিম্বিসারের রাজত্বকাল থেকেই মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল।

বিম্বিসারের জীবনকথা

বিম্বিসারের পিতার নাম ছিল ভট্টিয় বা মহাপদ্ম। অঙ্গরাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্ত একদা বিম্বিসারের পিতা রাজা মহাপদ্মকে পরাজিত করেছিলেন। বিম্বিসার পনের বছর বয়সে রাজা হন। রাজা হয়ে তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে অঙ্গরাজ্য দখল করে নেন। তার পর থেকে মগধ রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। রাজা বিম্বিসার অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর সৈন্যবাহিনী খুব পারদর্শী ছিল। যুদ্ধে তিনি হাতি ব্যবহার করতেন। ফলে তিনি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জানা যায়, তাঁর রাজ্যে আশি হাজার শহর ছিল। শহরগুলোর মধ্যে তিনি সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। কোসল রাজ্যের রাজকুমারীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি কোশল, বৈশালী, গান্ধার, অবন্তী প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন।

রাজা বিম্বিসার প্রাচীন রাজগৃহ নগরী নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানে ছিল তাঁর রাজাপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিক পাথরের প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। রাজগৃহে বুদ্ধ অনেকদিন বসবাস করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধর্ম উপদেশ দান করেছিলেন। এখানে প্রথম ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছিল। এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। রাজগৃহের নিকটেই অবস্থিত ছিল নালন্দা।

রাজা বিম্বিসার সুশাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। সব সময় প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। বিম্বিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। পরে দেবদত্তের প্ররোচণায় অজাতশত্রু পিতৃবিরোধী হয়ে ওঠেন। একসময় তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁকে খাবার দেয়া বন্ধ করে দেন। বিম্বিসার কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পয়ষট্টি বছর।

রাজা বিম্বিসার অন্য রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় রাজা ও উত্তম সংগঠক। পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যের রাজারাও তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন। গান্ধারের রাজা পুক্কুরসাতি তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবককে প্রেরণ করেছিলেন। জীবক ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক।

রাজা বিম্বিসারের রাজ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই সমসাময়িককালে বিকাশ লাভ করেছিল। মহাবীর জৈন, গৌতমবুদ্ধ এবং রাজা বিম্বিসার প্রায় সমকালীন ব্যক্তিত্ব। রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও জৈনধর্মসহ সে সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি নিয়মিত রাজ্য পরিদর্শন করতেন। গ্রামের শাসক গ্রামিকদের সাথে তিনি সবসময় মতবিনিময় করতেন। কথিত আছে তিনি আশি হাজার গ্রামিকের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যের রাস্তা-ঘাট ও বাঁধ নির্মাণ এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
বিম্বিসারের জীবনকাহিনী লেখ

পাঠ : ২

বুদ্ধ ও রাজা বিম্বিসার

বুদ্ধত্ব লাভের আগেই রাজা বিম্বিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বোধি জ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে প্রথমে তিনি অনুপ্রিয় নামক আমবাগানে পৌঁছেন। সেখানে তিনি মস্তক মুণ্ডন করেন। তারপর কাষার বস্ত্র পরিধান করে সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেন। এ সময় তিনি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। পায়ে হেঁটে তিনি এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যেতেন। এভাবে তিনি বৈশালী থেকে রাজগৃহে পৌঁছেন। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সৌম্য-শান্ত অপূর্ব সুন্দর এক যুবক ভিক্ষা করছেন। রাজগৃহের নগর রক্ষীরা তাঁকে দেখে অবাক হন। এ খবর তারা পৌঁছে দেন রাজা বিম্বিসারের কাছে। রাজ প্রাসাদ থেকেই রাজা বিম্বিসার তাঁকে দেখতে পান। রাজা নিজে এসে তাঁর সাথে দেখা করে ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলেন। রাজা তাঁকে এই কঠিন ব্রত ছেড়ে রাজসুখ ভোগ করার আহ্বান জানান। সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তখন সিদ্ধার্থ রাজা বিম্বিসারকে বলেন, 'মহারাজ! আমি সুখপ্রার্থী নই। আমি কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছি।' রাজা বলেন, 'বৎস! আপনার পিতা আমার পরম মিত্র। আপনার উদ্দেশ্য জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন আমাকে একবার দর্শন দেবেন। আমি আপনাকে পূজা করব, বন্দনা করব।' রাজা বিম্বিসারের কথায় সিদ্ধার্থ সম্মতি প্রদান করে সেখান থেকে বের হয়ে যান।

রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে বুদ্ধের আবার দেখা হয় বুদ্ধত্ব লাভের পর। তখন বুদ্ধ রাজগৃহের লট্‌ঠি বন উদ্যানে বসবাস করছিলেন। তার দুই বছর আগেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। লোকমুখে তাঁর যশ-খ্যাতির কথা শুনে রাজা বিম্বিসার তাঁর সাথে দেখা করেন। বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের কাছে নতুন ধর্মের বাণী শোনার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে দান, শীল ও স্বর্গ সম্বন্ধে সরলভাবে ধর্ম উপদেশ দান করেন। তারপর, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য বা উপাসক হন। এ সময় রাজা বিম্বিসারের বয়স হয়েছিল ঊনত্রিশ বছর। সে সময় রাজা বিম্বিসার ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে নানা ধর্মকথা শোনান। রাজা ধর্মকথা শুনে আনন্দচিত্তে বুদ্ধকে বললেন, 'প্রভু! ছোটকালে আমার পাঁচটি কামনা ছিল। তা আজ পূর্ণ হলো।' কামনাগুলো হলো :

১. আমি ভবিষ্যতে রাজপদে অভিষিক্ত হব।

২. আমার রাজ্যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হবেন।

৩. আমি সেই বুদ্ধকে সেবা ও পরিচর্যা করব।

৪ সেই ভগবান বুদ্ধ আমাকে ধর্মোপদেশ দান করবেন।

৫. আমি বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করব।

তারপর রাজা বিম্বিসার অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁর রাজ্যের অতি মনোরম বেনুবন উদ্যান বুদ্ধ এবং তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিম্বিসারের সঙ্গে বুদ্ধের কখন এবং কীভাবে সাক্ষাৎ হয়?

রাজা বিম্বিসারের কামনাগুলো লেখ (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৩

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিম্বিসারের অবদান

বুদ্ধের উপাসক হওয়ার পর থেকে রাজা বিম্বিসার নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করতে থাকেন। তিনি ছত্রিশ বছর বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের সেবা করেন। তিনি মগধের অধিবাসীদের ধর্ম দেশনা করার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধে মগধবাসীর উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা করেন। সেই সময় থেকে ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক গৃহীদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

এ সময় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে সমবেতভাবে ধর্ম আলোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা তাঁদের নিকট ধর্মকথা শুনতেন। তাঁদের ধর্মে দীক্ষা নিতেন। রাজা বিম্বিসার এসব লক্ষ্য করে ভিক্ষুদেরও ঐ সব তিথিতে ধর্ম আলোচনার সুযোগ দিতে বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপোসথ পালন ও ধর্ম আলোচনার নির্দেশ দেন। রাজা বিম্বিসারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন জীবক। তিনি খুবই বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। রাজার আদেশে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসা করতেন। তাঁদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন।

ভিক্ষুরা আগে পুরাতন ও পরিত্যক্ত কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে সেলাই করে পরিধান করতেন। এতে ভিক্ষুদের অনেক রকম রোগ হতো। চিকিৎসক জীবক ভিক্ষুদের নীরোগ জীবন চিন্তা করেন এবং নতুন কাপড় পরিধানের অনুমতি প্রদানের জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ জীবকের আবেদন মঞ্জুর করে ভিক্ষুদের নতুন কাপড় পরিধানের বিধান দিয়েছিলেন। এর পর থেকে রাজা বিম্বিসারও ভিক্ষুদের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কাপড় দান করতেন। এভাবে রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধকে কী কী অনুরোধ করেছিলেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বুদ্ধ জনকল্যাণে দায়িত্বশীল হতে .... উপদেশ দিতেন।

২. .... ছিলেন মগধ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা।

৩. বিম্বিসারের পিতার নাম .... বা .... ।

৪. রাজগৃহের অদূরে .... অবস্থিত।

৫. বিম্বিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র .... রাজা হন।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বিম্বিসারের রাজত্বকাল থেকেই	ভিক্ষুদের নীরোগ জীবন চিন্তা করেন
২. গ্রামের শাসক গ্রামিকদের সাথে	তিনি সব সময় মতবিনিময় করতেন
৩. রাজগৃহ	মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল
৪. রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের	বাণী ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হন
৫. চিকিৎসক জীবক	পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিম্বিসার কে ছিলেন?

২. জীবক কে ছিলেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাজা বিম্বিসারের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. রাজা বিম্বিসার কীভাবে বুদ্ধের অনুরাগী হয়েছিলেন বর্ণনা কর।

৩. বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারে রাজা বিম্বিসারের অবদান আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীবক কোন রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন?

ক. শুদ্ধোদন খ. অশোক

গ. বিম্বিসার ঘ. অজাতশত্রু

২. রাজ্য বিম্বিসার সুশাসক হওয়ার কারণ, তিনি—

i. প্রজাদের ভালোবাসতেন

ii. ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন

iii. যুদ্ধের কৌশল জানতেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কানাইমাদারী গ্রামের উপাসিকা পুষ্পরানী বড়ুয়া নিজ গ্রামে একটি বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটি তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। এ উপলক্ষে ঐ গ্রামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শ্রদ্ধেয় ভন্তে দেশনাকালে ঐতিহাসিক বেনুবন উদ্যান দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এ ধরনের কাজ সদ্ধর্ম উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৩. পুষ্পরানী বড়ুয়ার কর্মটি ধর্মীয় দৃষ্টিতে বলা যায়—

i. ধর্ম প্রচার ও প্রসারে অবদান

ii. ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা দান

iii. পুণ্যাংশ অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. পুষ্পরানী বড়ুয়ার কর্মে বিম্বিসারের কোন চেতনা প্রেরণা যুগিয়েছে?

ক. শ্রদ্ধা চিত্তের খ. আন্তরিকতার

গ. সেবা করার ঘ. খ্যাতি অর্জনের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিঝুমপুর শহরের রক্ষীরা মেয়রকে গিয়ে বললেন গভীর বনে জনৈক সৌম্য, শান্ত ও সুন্দর শ্রমণ ভাবনা করছেন। মেয়র উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানতে চান। উত্তরে তিনি বললেন সংসার দুঃখ থেকে মুক্তির আশায় এ পথ বেছে নিয়েছেন। বিষয়টি জেনে মেয়র খুব খুশি হলেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত শ্রমণের যেন কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় মেয়র সেদিকে নজর রাখতেন। শ্রমণ যখন মার্গফল লাভ করলেন তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মেয়র বিহার নির্মাণ করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেন।

ক. বিম্বিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?

খ. সিদ্ধার্থ ও রাজা বিম্বিসারের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতে কী আলোচনা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় রাজা বিম্বিসারের জীবনের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মেয়রের মতো ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে মতামত দাও।

সমাপ্ত

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৬–বৌদ্ধধর্ম

জীবহত্যা মহাপাপ
– গৌতম বুদ্ধ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :